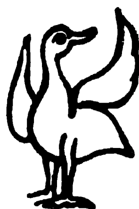
একা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়



সংকেত ভবন
৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট
কলকাতা-২০

প্রথম সংস্করণ
জানুয়ারি ১৯৪৮
পৌষ ১৩৫৪

দুই টাকা

শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট থেকে কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টো
র্তৃক প্রকাশিত এবং ঐ ঠিকানারই রংমশাল
মিটেড থেকে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মু

শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র-কে

এই বইতে যে-সব কবিতা ছাপা হোলো তার মধ্যে কতকগুলি কবিতা ইতিপূর্বে 'সোনার কপাট' এবং 'রাজধানীর তন্দ্রা' নামে আমার আগেকার ছুটি পুস্তিকায় ছাপা হয়েছিলো। অন্যান্য কবিতাগুলি নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, কেবল 'একা' কবিতাটি অপ্রকাশিত। কবিতাগুলি নানা সময়ে লেখা, তাই নানা কবিতায় আগস্ট আন্দোলন, জাপানি বোমা, ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ, ১৯৪৭-এর দাঙ্গা, ইত্যাদি নানা ঘটনার ছায়া পড়েছে।—লেখক

গ্রন্থকারের বইয়ের পূর্ণ তালিকা :

কবিতা

শবরী, মৈনাক, শিবির, সোনার কপাট
রাজধানীর তন্দ্রা,
একা

ছোটোগল্প

শ্মশানে বসন্ত, দ্বিতীয়া

উপন্যাস

পূর্বরঙ্গ

ছোটোদের গল্প

ছায়ামূর্তি, ঘনশ্যামের ঘোড়া,
ছাতুবাবুর ছাতা

ছোটোদের উপন্যাস

শ্বেতচক্র

সূচীপত্র

People change and smile : but the agony abides.

T. S. Eliot.

প্রেমিকার জন্য

সূর্যহীন বিজয়ী স্তব্ধতায়
ধূসর জলের ছায়ার মতো আমাকে ভালোবেসো

গাছে নতুন বসন্তের ইঙ্গিত নেই
অরণ্যের ঈশ্বর আমাকে মুক্তি দাও
আর চুপিচুপি বোলো
কবে থেকে আমাকে তুমি ঘৃণা কর
ক্যান্সারের মতো।

বসন্তের প্রথম রাত্রি

যে-সমস্ত কথায় এতোদিন নিজেকে ঢেকেছো
কুয়াশা নদীকে যেমন ঢাকে
আর সূর্য যেমন ঢাকে অন্ধকারকে,
আজ প্রথম বসন্তের রাত্রে
তুমি বেরিয়ে এসো তাদের ফেলে।

কী উত্তর দেবে আজ ?
অন্ধকারে পাহাড়ি ফুলের মতো তুমি
আর তোমার দেহ
গোধূলির শূন্যতার মতো।

ইতর লোকের মুখে শুনেছি তোমার নাম
প্রফেসারের মুখেও শুনেছি তোমার কথা
আর শিশু যেমন অন্ধকারে ঘুমন্ত হাত বাড়ায়
একান্ত কামনায়
আপিস-ফের্তা সেই রকম তোমাকে চেয়েছি।

বড়দিনের পরের দিন

কালো বিদ্যুতের মতো দিনের আলোয় ঝিমঝিম
তোমার মন,
আসন্ন অরণ্যের সবুজ স্তব্ধতায়
নিশ্চুপ।

তোমার হাত যেন খোদাই-করা সৌন্দর্য।
অনেক পরিচিত কুয়াশায়
আমরা পাশাপাশি চলেছিলুম
তারপর সূর্য এসে পথ আগলে দাঁড়ালো।

শীতে কুঁকড়োনো ভিখিরি তিনটি
আর বেকার কুকুর একদিকে।
দীর্ঘতম রাত অন্ধকারে আর শিশিরে ভিজে
দিনের আলোয় হাসপাতালের ফুটপাথ।
দূরের গম্বুজে রোদ ঝিকমিক, আকাশ নীল।

বিচক্ষণ সার্জেনের মতো
কনকনে হাওয়া আমার মধ্যে ছুরি চালালো।

চাপা ঠোঁটের ওপাশে
জলের ছায়া : আকাশের নীল উদ্যান, মেঘের ফুল,
সূর্যঘন দিন।

তারপর বর্ষায় একাকার মন।
তোমার কথা মরুভূমিতে উটের পায়ের চিহ্ন যেন।

বন্ধ্যা আকাশ মৃত্যু ছড়ায়
রাত্রি ভাড়াটে চাঁদ আনে।
ইস্পাতের সঙ্গীত গোলাপী হয়ে উঠলো।

ঘাঘরার ফেনায় অনেক শতাব্দীর নারী
পাহাড়ে কখনো বসন্ত কখনো বা শীত
দেবদারুর পাতাগুলি সবুজ বিদ্যুতের মতো।

অসুস্থ শয্যায় মুমূর্ষু তারার দৃষ্টি
আলনায় শাড়ি-ব্লাউজ-পেটিকোট।
দূরে কার বাড়িতে শাঁখ বাজলো—
হে রাত্রি, হে আকাশ, ওগো প্রথম প্রেম।

কৃতী

হেমন্তের সূর্যাস্ত মেঘের মতো রঙীন মন নিয়ে
অনেক হাজার শুকনো ঘাসের পথ পাড়ি দিলে।
আজ পিঠ বেঁকেছে, বুক খালি,
দাঁতে পায়োরিয়া, রাতে অনিদ্রা, চোখে ছানি।

একটি মেয়েকে তুমি ভালোবেসেছিলে,
তার স্বামী রায়বাহাদুর হয়ে মারা গেলো।
ছোটো ছেলে মেম বিয়ে করেছে,
বড়টি দারোগা।

অনেকগুলি সূর্যাস্ত পেরিয়ে এসেছো।
চাঁদের আলোয় মনে ট্যান ধরেছে।
এখন তোমার একমাত্র ভাবনা :
প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা কিসে খাটাবে।

প্রতিধ্বনি

সি-গালের শাদা বুকের মতো
কুয়াশা-ঘেরা হাড়ের পাহাড়।
হে সূর্য! সেখানে তুমি প্রতিধ্বনি তুলছো
মানুষের সহস্র অনুভূতির,
প্রতিধ্বনি তুলছো বিষণ্ণ বিরহের
আর আসন্ন মিলনের।

হে সূর্য! আমি যখন থাকবো না
আমাকে পুড়িও, তবু পুড়িও না
এই সব প্রতিধ্বনিকে
যারা ঝাড়লণ্ঠনের মতো অজস্র দ্যুতিময়।

চাঁদকে তুমি শাদা আলো ধার দিও,
পৃথিবীকে দিও সবুজ, মঙ্গলগ্রহকে লাল।
জীবনকে ধার দিও মৃত্যু
আর মৃত্যুকে ধার দিও এই সব শ্বেত প্রতিধ্বনি
সি-গালের বুকের মতো শাদা আর তাজা।

তিনজন

আমি তাদের তিনজনকে দেখলুম :
মেয়েটি জমকালো রূপসী,
নীল চোখ, টানা ভুরু, শাদা রঙ।
ছেলেটি ছ'ফিট লম্বা, নেভি-ব্লু স্যুটপরা, সুপুরুষ
তৃতীয়জন আমাদের পাড়ার কুকুর,
ভারি অলস, সব সময়েই হাই তোলে।

তাদের দু'জনের কথা সবাই বলে,
ছেলেটি কোনো আপিসের ভাবী বড়সায়েব
মেয়েটি নামকরা মেয়ে।

কুকুরটা কথা বলে না, হাই তোলে,
তাকেই সবচেয়ে বুদ্ধিমান মনে হোলো।

এই গাছ

এই বজ্রদগ্ধ গাছের শিরা বেয়ে
পৃথিবী একদিন ফুল হয়েছিলো, কখনো ফল,
কখনো সবুজ, কখনো সৌরভ।
শীতের সায়াহ্নে সে আজ দূরের নদী দেখছে,
যেখানে মৃতদেহের দগ্ধ হাড়, গুঁড়ো হাড়ের মতো বালি,
চাকার দাগ, যারা বেঁচে রইলো তাদের অশ্রু।

এই গাছ শুধু দেখছে :
নদীর ওপারের বন ছুঁয়ে চাঁদ উঠে এলো,
নটীর মতো নিটোল, চোখের নীচে কালি,
প্রথমে লাল, পরে শাদা, হাসপাতালের নার্সের মতো।

এই গাছ ভাবছে :
একদিন চৈত্রের ঝড়ে তার দেহ মর্মরিত ছিলো
একদিন ভ্রমরের ভিড় ঘিরে ছিলো স্তাবকের মতো
একদিন পৃথিবী তাকে ছুঁয়েছিলো—
আজ সে-পৃথিবী ভুলে গেছে!

স্তব্ধ রাত্রির মধ্য আকাশে রূপালি-আগুন-লাগা চাঁদ
শীতের শুকনো নদীতে কয়েকটা শেয়াল সন্তর্পণে ঘুরছে
মাঝেমাঝে পোড়া-কাঠ আর গুঁড়ো হাড়ের মতো বালি
আর একটি বজ্রদগ্ধ গাছ একপায়ে দাঁড়িয়ে।

রাজধানীর তন্দ্রা

অনেক স্বরের কুজ্ঝটিকায় ধ্বনিত সায়াহ্ন :
"কোথায় উঠেছেন ?" "ওখ্‌লায় কত জল ?"
"এই ফুলিশ্‌ মুভমেণ্ট"
(মিসেস দাসের শাড়িতে বুর্জোয়া সেণ্ট)
"আর একটু চা ?" "নো,থ্যাঙ্কস্‌।" "ডেভিকোয়
সাড়ে আটটায় ?"
"আমেরিকানরা সভ্য, দেখেছেন টমিরা কী রকম তাকায় ?"
পিঠ-বুক-হাতকাটা জামায়
বললেন মিসেস রায়।

এদিকে পড়ন্ত রোদের চুণি-পান্না-গলানো আলো
গম্বুজে-মিনারে-মসজিদে অকৃপণে ছড়ালো
কয়েক মুহূর্তের বিলাসিতা। কালো বুরখায় সারি-সারি কারা ?
আকাশে কয়েকটি তারা।
রেডিয়োয় গান, মসজিদে আজান, পথে শ্লোগান,
'বারে' পান,
সরকারবাহাদুর আনন্দ যোগান।

কালো ভেরি বেজে উঠলো :
কালো আর ভারি আর স্তব্ধ।
মুখ দেখা যায় না, আকাশে মেঘ, আসন্ন গাম্ভীর্য।
"আপনি ডিফিটিস্ট।"
আমি ডিফিটিস্ট ?
"আপনি এস্কেপিস্ট।"
আমি এস্কেপিস্ট ?
"আপনি সেক্রেটারিয়েটে ক্লার্ক।"
আমি ক্লার্ক ?

গুনেগুনে পা ফেলে চলি। যত যাই ভাবনা।
কাজে লাগতো ভালো সেলাম করতে জানলে।
(কবিতা কি মৃত্যুর অগ্রদূত ?)
শুধু মাঝে-মাঝে দুঃস্বপ্নে ঘুম ভাঙে :
অতীত স্বপ্নে কথা কয়।
ভবিষ্যৎ দেখা যায় না। সামনে কালো অন্ধকার। ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি।
এ-অন্ধকারে পাশাপাশি দাঁড়ালে সবাই সমান।
এ-অন্ধকারে কোনো দূরত্ব নেই।
যমুনায় ডেকেছে বান
স্তব্ধ রাত্রে নেই গান, নেই শ্লোগান।

কুমকুম্

(বিষ্ণু দে-কে)

যেখানের মরা পৃথিবী গাছকে
স্তন দেয় না ; আজকে
বাহারি হেমন্ত তাকে নিয়ে
মেঘ-রৌদ্রের পাত্রে সোনা ভাঙিয়ে
যায়।
শরীর আর মনের অবাধ্যতায়
আমরা চঞ্চল। ইন্দ্র তার বজ্র চালাক,
(আমরা আরো চালাক !)
কঠিন আলোয় শাদায়-কালোয় শাশ্বত কণ্ঠের জয়গান
গোয়ালে গরু, মরাইয়ে ধান—
দুর্লভ স্বপ্ন।
সকালে বাজার, দুপুরে আপিস, রাত্রে তাস। নগ্ন
শিশু, ছিন্ন কাঁথা, সুতিকা, ক্ষয়কাশ—
জীবন জ্যামিতির ফাঁস।

হেমন্তের সূর্যভাঙা সন্ধ্যায় আলোর কুমকুমে
ক্লান্ত চোখ চমকালো। ঘুমঘুমে
নেশায় নিজেকে ভালো লাগলো।
(সূর্য, তোমার এতো আলো !)
...পিরামিড, গণ্ডোলা-হেলেন...
স্মৃতির কাঁথায় এলেন
ঈশ্বর।
সৈনিক সময় বিশ্ব'র
বুকে সরীসৃপের মতো
সূর্যভাঙা সন্ধ্যায় আলোর কুমকুম তবু তো।

কুম্‌কুম্‌

কবে নীলকণ্ঠের অগ্নি
সুন্দরকে ভস্ম করেছিলো। বিকেলে চিনেবাদাম-ঘুগনি
ফেরি করে। শীতে জড়সড়।
মনে ঠাণ্ডা সাপ ; মাঝে-মাঝে খর-
রৌদ্রের গান ভেসে আসে।
সমস্ত আকাশ একটি মেয়ের মুখের মতো ; দু-পাশে
ঠাণ্ডা দিন, ঠাণ্ডা রাত্রি। একটি
সরু রেখায় মশালের স্রোত আঁকাবাঁকা। একটি-
একটি মানুষ : কয়লার পাউডারে, কালির ক্রিমে,
সারিসারি দূরে দূরান্তরে অসীমে।

হে কুমারী মেয়ে আর ঠাণ্ডা সাপ
কাস্তের মতো ধারালো গলায় তোমরা জয়গান গাও।
হে নীলকণ্ঠ !
অসুন্দরকে ভস্ম করে আজ তোমার প্রায়শ্চিত্ত হোক।

হামি জমিদারবাবুর দরোয়ান। সড়কের পাশে
দেউড়িমে থাকি। খৈনি খাই। ঘাসে
লাঠি ঠুকি। রসুই পাকাই।
বাবু মস্ত রাজা। আছে নোকর-নায়েব-সিপাই
আউর পুরনো মস্ত বাড়ি
আউর বারোটা জুড়ি, সতেরটা হাওয়া গাড়ি।

বাবুর বড়ছেলে মেট্রিক পাশ দিলো।
বাবু সাতদিন মদ খেলো।
দোসরা মহলে বাবুর লেড়কা ভি। মস্ত ভোজ হোলো। বাইজি
নাচলো ; মাইজি
বড়া ভারি সোনার হার বকশিশ দিলো।
মিষ্টি বিলি হোলো।

সেদিন খেঁদিঝি আউর তার
লেড়কিকে মাইজি ঝাঁটাপিটে তাড়ালো। হামি জানি কার
ঘরে মাঝরাতে
তার লেড়কিকে মিলেছিলো। (সে বাবুর বড়ছেলে) তাতে
হামাদের কী ?
হামি খৈনি খাই, রসুই পাকাই, দেউড়িমে থাকি।

বাবুর এক বিটি ভি আছে।
ডেরাইভারের কাছে
সে ঠাট্টা করতো, হাসতো ভি
মগর মালুম হুয়া নেই তার সাথ ভগবে কভি !
ভিতর-ভিতর বহুৎ গণ্ডগোল : পুলিশ রুপেয়া ঘুষ
হামরা ভি বকশিশ পেয়ে খুশ।

লেড়কি লৌটকে এলো
ফুর্তিসে বাবু আউর লেড়কা দোসরা-দোসরা মহলে বহুৎ মদ
খেলো।
ইসমে তুমার কী, হামার ভি কী ?
হামি জমিদারবাবুর দরোয়ান, দেউড়িমে থাকি।

দাম

সকালে বাসিমুখে চা খাবার আনন্দ
কাগজে তুফান তোলা
হায় আজ শেষ।
কুমড়ো-শাক-বেগুন বগলে বেঁধে
শনিবারের আনন্দ
কৃষ্ণনগরে গিন্নীকে দেখতে যাওয়া।

ছোকরা চলেছে, চলেছে ছ্যাকরা বুড়ো
কারুর পিসে কারুর খুড়ো
কিসে
দু-পয়সা আসে সেই হিসেবে দড়।

এখানে রাঁধুনে বামুন নেই
চাকর পালাই-পালাই—
তাই সই।

তবু কোকিলটা ডাকছে কেন জানো ?
আর শুঁয়োপোকা নিশ্চিন্ত ঢিমে তালে
আর টিকটিকিটা আপন মনে পোকা ধরে।

নেহাৎ বাজে নাও তো হতে পারে ;
কালির আঁচড়, ফাগুন-ঝরাপাতা
আকাশ-ভরা ঝড়ের খুসির খাতা
নীলচে চোখের ধারে।

শানানো চোখের সূর্য লোল স্তব্ধতায়
আপনাকে করেছ ধারালো।
ফাল্গুনে আগুন জ্বলে নীল শিখাময়
তারপর রাত্রি ঘনকালো।

কখনো সৌখীন চাঁদ :
মাথা ঝিম্‌ঝিম-করা আলো।
কখনো বাদুড়, কাল-প্যাঁচা, মশা,
পাউডার-স্নো-তে মাজাঘষা
বাতাসে-ফোলা শাড়ির ফানুষ
ভেতরে মানুষ।

একটু হাসি একটু কান্নায়
নিজেকে রান্না করে সুস্বাদু করা।
অনেক বাসি-পাপ আর টাটকা পুণ্যে
শূন্যে
বাসা বাঁধা।
কৃষ্ণ-সাধা
মন,
সর্বক্ষণ।

শাদা রোদ্দুরে, লাল মিছিলে,
রাজপথে, ডকে, মিলে,
সন্ধ্যায়
জনসভায়।
তারপরে : প্রেম, বিয়ে, ক্লান্তি,
চাকরি বিনে কোথা শান্তি ?

দারুণ জটিল এ-জীবন।
সকালে শস্তা দোকানে গরম চায়ের ফাঁকে
ভাগ করে কাগজ পড়া।
পোষা কোকিল নাগরিক বসন্তকে ডাকে;
কাকে কাকে লড়াই।
বোষ্টমী গলা সাধে :
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ শ্রীরাধে।

ফাল্গুনে আগুন জ্বলে নীলে
সাইরেন ডাকে জুট-মিলে

এসপ্লানেড

এসপ্লানেডে ট্রাম থেকে নামলুম
দু' চোখে মানুষের জনতা চাখলুম।
হঠাৎ এলুম কোথায় ?
পেঙ্গুইনের দেশে কিংবা সাহারা আফ্রিকায় ?
হাওয়া দিচ্ছে, চৈত্র দিনের হাওয়া
আমের মঞ্জরী, ও মঞ্জরী, আহা !
শরীরে আপিসের স্বাদ
ভাঁজে-ভাঁজে অবসাদ
কেটে বসেছে—
ফিরিঙ্গি মেয়েটা লোকটার বড় কাছে ঘেঁষেছে।
সামনে যে-পত্রিকা চান পাবেন : খাসা স্টল
ওধারে চৌরঙ্গি, ট্রাফিক পুলিস, টমি,
খাকি-কোর্তা, হোটেল ব্রিস্টল।
দূরে গড়ের মাঠ, (পকেট গড়ের মাঠ !),
পাশে কার্জন পার্ক, স্লিট ট্রেঞ্চ,
উলঙ্গ ভিখিরি, পাগল মেয়ে—লোকটা কি ফ্রেঞ্চ ?
আহা, খাসা ফরাসি দেশ !
—টেলিগ্রাম, বাবু টেলিগ্রাম : মহাত্মাজীর অনশন শেষ

সূর্য পশ্চিম আকাশে হামাগুড়ি দিয়ে নামছে
সমস্ত আকাশ, আহা সমস্ত আকাশ সোনা।
মেঘগুলো কি থমকে থামছে ?
হঠাৎ অনেক সোজা-সোজা আলোর তীর
আর গোধূলির বাসন্তী আবির
ঝরলো মানুষে-গাছে-পাতায়।
মহাকালের খরচের খাতায়

আমরা কি জমা হলুম ?
এসপ্লানেডে দাঁড়িয়ে সে-কথা একবার ভাবলুম।

রেস বুক, বাবু রেস বুক, প্যারিস পিকচার,
স্কুল গার্ল, ফিটন গাড়ি, ম্যালেরিয়ার মিকচার,
আর দাঁতের মাজন
পালাজ্বরের পাঁচন
আর ছোটো স্কার্ট, উন্নত বুক, ফাঁপানো চুল,
চালের আর কাপড়ের দর একেবারে নির্ভুল
আর দক্ষিণের হাওয়া আর সন্ধ্যার জাফরানি আলো
ছেঁড়া জামা মোটর জমকালো—
সমস্তই এখানে পাবেন।
এক পয়সায় চার খিলি পান
আর সস্তায় সানলাইট সাবান
না-চাইতে উপদেশ— ত-ও পাবেন
চত্বর সহরের হৃৎপিণ্ডে এই এসপ্লানেডে যদি খানিক থামেন।

এখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবতে পারেন
রুশদেশে বরফ-গলার সময় এলো কিংবা স্যর আর. এন্.
কী করে বড় হয়েছিলেন ?
ভাবতে পারেন
সমস্ত সৃষ্টির কাছে এ-পৃথিবী আলপিনের মাথার মতোও নয়
কিংবা বড় সায়েবের বড় ছেলে অঙ্কে পেয়েছে ছয় ?
ভাবতে পারেন একদিন আপনি মারা যাবেন
হয়তো আজই কিংবা কাল। (আপনাকে না নিয়েও সংসার
দিব্বি চলবে) আর ইস্কুলের সেই মোটা রাজেন
স্ক্রু বিক্রি করেই তিন লাখ জমিয়েছে

আর মল্লিকা সেন চার বছর বয়েস কমিয়েছে।
ভাবতে পারেন কি আপনি হাস্থন
কিংবা বাঁচুন কিংবা মরুন
কারুরই এসে যায় না।   ভিড় বলবে : সরুন।
তারপর ট্রামে চড়বেন আর কালিঘাটের টিকিট কিনবেন
আর যখন বাড়ি ফিরবেন তখন অন্ধকার
কিছুই মনে থাকবে না—উৎসাহও থাকবে না বাইরে যাবার

সোনার কপাট

মাঠ মাকড়সা ইঁদুর
আলতামাখা পা একমাথা সিঁদুর—
ওরা নিকট আত্মীয়।
আকাশ ঝরিয়ে দু-চোখ ভরিয়ে আমায় দিয়ো
অনেক-অনেক খুসির বুনুনি।
হে দিন হে রাত্রি, হে কুরূপা পাত্রী
তোমাদের সবাইকার
সম্বন্ধ নিকট। নমস্কার।

যেদিন জেনেছিলুম তোমাকে
যেন চকিত দেখা পেলুম ইন্দ্রধনুর বাঁকে
বিস্তীর্ণ রাজ্য।
ক্ষীরননীর দেহের ওপর পোষাক (চাকরের সাহায্য
তার ওপরে মাথা
তারো ওপরে মুকুট ছাতা
শান্ত্রি সেপাই :
হায়, শান্তি নেই, বিসর্জনী বেজেছে শানাই।

এই সব মরাকাঠের দেহে
চিড় ধরেছে রঙ ফেটেছে, (কেহে !
বেসুরো বক্‌ছো ?
তারার জ্যোৎস্নায় নিজেকে সেঁক্‌ছো ?)

ব্ল্যাক্-আউট দেখতে বেরিয়ো
মিসেস্ সেন-কে সঙ্গে নিয়ো।
ভোঁতা সময় হয়তো স্বচ্ছন্দে কাটবে
অনেকদিনের পুরনো মন অতীতকে চাটবে !

তারপর ব্যাগি-ট্রাউজারে
পা ডুবিয়ে, বাহারে
সোফায় মেদের অস্বাস্থ্য ঢেলো।
আর বোলো : 'আমরাই আস্ত।'

আমার বসন্তে রঙ ধরেছে
আর কোনো মেয়ে এশিয়ার আকাশ জয় করেছে।
ভ্রমর তার চোখে,
জুতোর সোলে মৃত প্রজাপতি ; নোখে
ক্যুটেক্স।
সাইকলজি আর সেক্স
আর সরু কোমর আর আধগজ সিল্কের
তিনটে ব্লাউজ দিয়ে আড্ডা বিকেলের।

হে সূর্য, হে জ্বলন্ত মাঠ,
আমায় পুড়িয়ে খোলো সোনার কপাট

ভরাট

ধানশীষ রোদ্দুরে টাটকা মাঠে
কাস্তের বিদ্যুতে শক্ত মুঠি।
সন্ধ্যার চাঁদোয়ায় নীলচে তারায়
আসল ছুটি।

টলটলে চোখ ছুটি শান্ত খুসি,
পলাশ তোমার রাঙা আঙুল যেন ;
কাজল রেখায় চোখ দীর্ঘ করে
ডেকেছো কেন ?

বাতাসে অরণ্য এলো অনেক দিনের ;
আকাশে চাঁদের শাদা মুকুট জ্বলে ;
একটি তারার মতো নিজেকে নিয়ে
যাচ্ছো চলে।

ধানশীষ-ছায়া মাঠে হালকা খুসি
কাস্তের বিদ্যুতে একটি মেয়ে।

সময়

জীবন্ত সময়খানি আকাশের সামিয়ানা যেন
বারেবারে উড়ে যায়, বারেবারে ফিরে আসে কেন
সেই কথা ভাবি একা সায়াহ্নের সঙ্গীহীন ক্ষণে
সেই কথা হানা দেয় এ-মনের দুরন্ত গহনে।

নাটকীয় নাভিশ্বাসে জল আর স্থলের প্রস্তাবে
নতুন পৃথিবী গড়া, কামনার বিষণ্ণতাখানি
বয়সের শূন্যতাকে এঁকে দিলো কঠিন বাস্তবে
সরল তির্যক সুরে—তার কথা সবটাই জানি।

তবু আজ গান গাই। সায়াহ্নের আধ-ফোটা তারা
এখনি হারিয়ে যাবে রেখে শুধু মৃত্যুর পাহারা।

কোনো নির্জন মুহূর্তে

এ-অশান্ত হৃদয়ের স্পন্দন শুনেছি বহুদিন
ভুলে-যাওয়া গানগুলি তুলে নিলো সময়-বিলীন
তোমার আরক্ত মন।
নির্জনতা দিয়ে
নির্জন প্রাসাদ গড়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে
কার পদধ্বনি শুনি।
মৃত্যুর মতন বয়ে যায়
অন্ধকারে কালো স্রোত দূরান্তরে অশনি ঝঞ্ঝায়।

হে অশান্ত মন! তোমার চূড়ায়
স্বাতী নক্ষত্রের নির্জন শ্বেতাভা।
কোনো প্রজাপতি
বসন্তের বনগন্ধে দক্ষিণের রঙীন উৎসবে
হয়তো পৌঁছবে
একটি ফুলের রেণু বয়ে।
মুহূর্তে সমস্ত দিক রোমাঞ্চিত হবে গান গেয়ে।
মেঘের ছায়ার মতো ছেয়ে যাবে
তুষার শ্বেতাভা মুছে যে-মুখ চেয়েছো খুঁজে পাবে।

ছায়া

কামরাঙা রঙ রেশমি শাড়িটি
সন্ধ্যা-রঙীন বাতাসে,
স্মৃতির পাঁজরে জোনাকির মতো
স্পন্দিত তারা আকাশে।

অবাধ্য

খোলা জানলায় মুখ তুলে ভুলে যাই
নীচের মনের পাঁজরে করেছি যাচাই।
দূরে নারকেল পাতাগুলি ঝিরঝির
সুর লাগে মেঘে ছিন্ন শতাব্দীর।

নীলে নীল দিয়ে ভুলেছে আমার মন
বহুদিন পরে এসেছে কি শুভক্ষণ?
কুয়াশার মতো ঝাপসা অনেক আলো
আরো দূরে দেখি বিদ্যুৎ চমকালো।

গভীর হাড়ের আড়ালে স্বর্ণরেখা
একলা নদীর আহ্বানে আছে আঁকা।
বারণ করেছি তবুও কি ছাই শোনে?
কালসিটে-পড়া চাঁদ ওঠে দক্ষিণে!

মুখ

তোমার মুখের মতো আর কোনো মুখ দেখিনি তো
তোমার চোখের মতো অন্ধকার গভীর অতল
তোমাকেই তাই আজ প্রশ্ন করি অনেক দিনের
অদৃষ্টের এই রেখা আজ সে কি হয়েছে সফল।

বৈশাখের আম্রকুঞ্জে মঞ্জরীর সফল শুভ্রতা
বাতাস মন্থর হলো, মন আজ উড়ে যায় কোথা ?
সমুদ্রের স্বাদ পেয়ে সে কি আজ দুরন্ত হয়েছে
কোনো ঝাউবন তার বাঁকা পথে ছায়া ফেলে গেছে ?

এ-সব আমার কথা, তাই দিয়ে তোমাকেই চিনি
তোমার মুখের মতো কোনো মুখ কোথাও দেখিনি।

ঘুম

স্রোতের স্বচ্ছতা নিয়ে গোধূলির বিষণ্ণ বিরহে
তির্যক বিদ্যুৎ হেনে দগ্ধ করে স্মৃতির কঙ্কাল
এসো মহাকাল।
রক্তে শুনি পদধ্বনি। সে অতীত পুনরুজ্জীবিত
ভয়ঙ্কর মৌন গানে
ভয়ঙ্কর শান্ত প্রাণে
হে অতীত সূর্যস্নানে জীবনে স্পন্দিত।

তোমাকে পেয়েছি ফিরে মুহূর্তের পানপাত্রে আজ
এ আমার স্পর্ধা নয়
জীবন তো ব্যর্থ নয়
নয় স্বপ্নসাজ।

কঙ্কন ঝঙ্কারে এসে ক্ষীণকটি নীলাম্বরে ঢেকে
তির্যক বিদ্যুৎ হেনে ত্ু'নয়নে স্নিগ্ধ ঘুম এঁকে।

কোনো মুহূর্তে

এসো নীল নির্জন শান্ত আকাশ
আমাদের অবচেতনায়,
এসো নিষ্পাপ দিন চৈত্ররঙীন
গোধূলির রাঙা বেদনায়।

ঢেউ

আমের মুকুলে ফাগুনের আলো তুলেছে ঢেউ
আমাদের কথা জানে না কেউ।
রজনীগন্ধা ঋজু আর শাদা হয়ে
স্মৃতির স্তূপকে আলগোছে ছোঁয়
ভীরু তার হাত দিয়ে।

অনেক পাখীর কাকলিতে ভরা সন্ধ্যা
রাত আসে দেখি মৃত্যুর মতো বন্ধ্যা।
মনের আকাশ স্তব্ধ বিশাল : ছিলো কি কেউ ?
আমের মুকুলে ফাগুনের আলো তুলেছে ঢেউ।

সংকেত

যদি ছুটি চাই
অনির্দিষ্ট অন্ধকারে দুরন্ত চড়াই
তখনো মনের কোণে
সূর্যরাঙা আমন্ত্রণে
তোমার শরীরী স্মৃতি ফিরে পাই

কবে কোন শরতের স্পন্দিত নেশায়
সাঁওতালী সবুজ ক্ষেত
স্পন্দিত সংকেত
এনেছিলো রক্তকণিকায়।

চুলে দিয়েছিলে ফুল
সেকি ভুল, সেকি ভুল ?
(সে রাত্রি কোথায় ?)
আকাশের স্বচ্ছ চোখে
প্রেম-মৃত্যু তুলে রেখে
অন্ধকারে অন্ধ চোখে ছুটি চাই

চাঁদের ঝড়

মৃত্যু যদি আসে এ-নীল দিনে
জানি তবু আমায় নেবে চিনে
ফাল্গুনে ঐ গোলাপ-রাঙা ঠোঁটে
হালকা হাওয়ার বনে।

বন্য পাখী নতুন দিন আনবে
তারার বনে চাঁদের রথ টানবে।
ঢেউয়ের মতো তোমার দেহের তীরে
আমায় নিয়ে আমায় ভালোবাসবে।

চাঁদের ঝড়ে আমার দেহ মেলবো
তোমায় নিয়েই আমায় আমি ভুলবো

অর্কেস্ট্রা

১

বেদনা-বিস্ময়ে আমি চেয়ে দেখি উদাত্ত আঁধার
ভ্রমরের মতো কালো কম্পিত চোখের দীঘি তার।
ও-পাশে অনেক দিন সুবর্ণের আত্মসমর্পণে
ছায়া ফেলে পাখা মেলে উড়ে যায় মনের দর্পণে।
আমি ভাবি, শুধু ভাবি : কালো চোখ তার।

২

চাঁদকে তুমি জ্বালিয়েছো
স্বপ্নে আগুন লাগিয়েছো।
অনেক রাতে অনেক দিনে
অনেক খুসির আকর্ষণে
আমায় তুমি ভাবিয়েছো।

৩

এক ফালি চাঁদে কী হবে আজকে বল না।
অনেক দেখেছি চিনেছি ও-বাঁকা ছলনা।
একা নিরিবিলি খেয়ালের ছায়াপথে
ঘোরা শেষ করে এসেছি তোমাকে নিতে।
দূরে দেখো ওই নীলার আকাশ, মমতায়
আরো নীল হোলো। নেমে এসো এই জনতায়

৪

তনুতে তনু নয়নে নয়ন মনেতে পঞ্চশর
কাজল দিনের মেঘের হাটে হয়েছো জাতিস্মর।
কাটছে বেলা হলুদ আভায় নীলের চন্দ্রাতপ
জীবন বনের ক্লান্ত পাখার তীব্র মানন্তর।

অর্কেস্ট্রা

দিন হলো নিঃশেষ
রাত হোলো নিঃঝুম
মন হোলো উন্মন
প্রেম আর— আর ঘুম।

কালো পাহাড়

বারবার শুধু এক কালো পাহাড়ের ছায়া
অনুভব করি : বোবা, কালো, মৃত
সেই পাহাড়।
সেখানে কি কোনো দিন গিয়েছিলুম ?

ট্রামে ভিড়, উত্তরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে,
সিগারেটের ছাই চোখে এসে লাগলো,
কে যেন চাকরি পেয়েছে, খেলার মাঠের গল্প,
সেকেণ্ড ফ্রন্ট, যুদ্ধ শেষ হবে—
কিন্তু মনের মধ্যে বারবার সেই কালো পাহাড়
ফিরে-ফিরে আসছে।

আমাদের মতো যে বাড়ে না, বাঁচে না, খুসি হয় না,
আমাদের মতো যে জাগে না, ঘুমোয় না, ভাবে না,
সেই রকম এক বিরাট কৃষ্ণ উপস্থিতি
মনের মধ্যে আসছে ফিরে-ফিরে।
সেই পাহাড়ে কি কোনো দিন গিয়েছিলুম ?

মধ্য-দিনে বাঁশবনের সবুজ জ্যোৎস্না চুঁইয়ে পড়ছে
শুকনো পাতা আর ভিজে ঘাস
আর ঝিঁঝিঁর ডাক। তুমি কথা কইলে :
এখানে একটু বসবে ?
কী গান গুনগুন করছো ?
পাহাড়ি হাওয়ায় তোমার শুকনো চুল উড়ছে।

কালো পাহাড়

এ কিন্তু সে-পাহাড় নয়
যার সৌখিন স্মৃতি মাঝেমাঝে ফিরে আসে।
এই কালো পাহাড় বিরাট অথচ স্তব্ধ
এর চাপ অহরহ সহ্য করছি, অথচ মৃত।
এ-পাহাড় শুধু আমার।
বোবা আর কালো
বারবার অনুভব করি এর ছায়া—

সেখানে কি কোনো দিন গিয়েছিলুম?

স্মরণে

তোমাকে এতোদিন দেখেছি স্বর্ণ-স্বাক্ষরে
এখনো দেখছি চাঁদ-সূর্যের রৌদ্রে
শরতের রোমাঞ্চিত কাশবনে
কৃষ্ণচূড়ার লাল অরণ্যে।

তুমি তো সৃষ্টি করেছো এই পৃথিবী
যেখানে বৃষ্টি পড়ে, আকাশ নীল।
সৃষ্টি করেছো জীবন
ভরেছো দূরবনগন্ধ আবেশে—
এখানে সূর্য অস্ত গেলো, সূর্যদেব কোন দেশে ?

এতোদিনে তোমাকে চিনলুম, তবু চিনলুম না!
সূর্যের মতো নিঃশব্দ অথচ বিরাট।
এইতো পৃথিবী :
আকাশ আর সমুদ্র
পাহাড় আর অরণ্য
সবুজ ছায়ায় হরিণ হাই তুললো
একটি তারা কোনো মেয়ের চোখে কাঁপলো।

তুমি চলে গেছো, রেখে গেছো এদের
আমি যখন চলে যাবো কী নিয়ে বাঁচবো ?

হে আকাশ

হে আকাশ যদি আর একবার জন্মাই
তৃণে কিংবা অরণ্যে
কিংবা তার গভীর কালো চোখে
আর দিগন্তের ইন্দ্রধনুর মতো
যদি স্পর্শ করতে পারি সময়কে
তবে যেন আবার
রৌদ্রকে ভরে তোলার গান খুঁজে পাই।

উপরের আকাশ তারার শাদা লণ্ঠনে উজ্জ্বল
কত বেদনার স্মরণাতীত আন্দোলন
আর বাতাসে
সমুদ্র-শূন্যতা স্পন্দিত।

হে আকাশ
তোমার নীল খাতায় এ-জীবনের সমস্ত আনন্দ-বেদনাকে
আর চাওয়া আর পাওয়াকে তুলে রেখো।
যদি কোনোদিন
আবার বাইশ বছরের যৌবন ফিরে পাই
যদি চাঁদের ক্ষয়িষ্ণু সত্তাকে আবার পারি ভরে তুলতে
যদি পারি আবার জন্মাতে
ঘাসের সবুজ রসে
শিশিরের অজস্রতায়
মেঠো সুরে, মাটির হৃৎপিণ্ডের কাছে
তা হলে
তোমারি খাতা থেকে
আবার ইঙ্গিত পাবো।
হে আকাশ

শাদা পথ

কত দিন পরে তোমাকে চিনলুম আবার !
এই সেই ধূসর শাদা পথ। ক্লান্তিহীন ভাবনার
গুঁড়ো হাড়ে গড়া।
কত দিন পরে, কত ওঠা-পড়া
পার হয়ে দেখলুম তোমাকে
উদ্দাম অথচ মৌন স্তব্ধতার ফাঁকে
কালপুরুষের ফিকে জ্যোৎস্নায়
হেমন্তের হলদে-সবুজ মাঠের পূর্ণতায়।
আর মনে হোলো রাত্রির মেঘের মতো কত কথা
মন থেকে উড়ে গিয়ে দিয়ে গেছে একটি স্তব্ধতা।

সবুজের ঝর্না আছে তোমার দু চোখে।
জোনাকি'র আলো-জ্বলা পাথরের ফাঁকে
চেয়ে দেখি শূন্য মাঠ : হেমন্ত-ধূসর
আর এক মৌন শাদা কঠিন ঈশ্বর।

তুমি যেন পথ হয়ে শাদা ধ্বনি ঘিরে
রেখেছো আহ্বান এক অশরীরী স্মৃতির গহ্বরে
চেতনায়-অবচেতনায়।
বিরহের ঋজু সুরে গোধূলির প্রদোষ-ছায়ায়
অস্পষ্ট মুখের মতো অন্ধকারে ফিরে-ফিরে আসে
স্বেদাক্ত সময় ঘিরে নির্জন মনের অন্য পাশে।

এই সেই শাদা পথ : সুগঠিত, বাস্তব, নির্মম,
হঠাৎ দিয়েছে ফিরে যা ছিলো মনের দূরতম
ঐশ্বর্যের সমারোহ। ভয়ে-ভয়ে তাকে স্পর্শ করি
না-বলা কথার বোঝা আজ বুঝি নামাতেও পারি

শাদা পথ

এই শ্বেত বোবা পথে, ঈশ্বরের আগুনের কাছে
যে-জীবন ছায়াপথে মনে হয় তাও বুঝি আছে।
অজানা মৃত্যুকে বুঝি সহজেই আজ খুঁজে পাবো
তারাদের গুঁড়ো হাড়ে এই পথে সুদূরে পাঠাবো।

এ-ঐশ্বর্যের সমারোহ কোন পথে নিয়ে যাবো তুলে ?
গ্রাম্য শিশুর সারি একে-একে জমা হয়। কঙ্কালে-কঙ্কালে
শাদা পথ ছেয়ে যায়।
রাত্রির বাতাসে শোনো কত হায়-হায়
কত অনাবৃষ্টি আর দগ্ধ পোড়ো ক্ষেত
আর কত মহামারি এঁকেছে সংকেত।
নিজেকে কাঙালী করে একদিন চেয়েছিলে কত
এ-অবাক পথে এসে অকস্মাৎ স্তব্ধ বুকে ভাববে : তাইতো

বিধবা-সিঁথির মতো এই শাদা পথ
তবুও তো চেয়েছিলে। তোমার উদ্দাম রথ
হে জীবন থামাও একবার।
শোনা যায় ট্রেনের লোহার ঝঙ্কার
আর নিজের স্পন্দন। রক্ত আর হাড় কথা কয়
মনে হবে জীবন-মৃত্যুও কিছু নয়।
সপ্তর্ষির ছায়া পড়ে দূরের কুয়াশা-ঢাকা বনে
পড়ে থাকে স্মৃতি এক বর্ণহীন মনের গহনে।

অঘ্রাণ

বহুদূর দিগন্তের শিশিরের ঘ্রাণ
নিয়ে এলে তুমি আজ রূপালি অঘ্রাণ।
যখন ওঠেনি তারা, সূর্য অস্ত যায়,
দিনান্তের ক্লান্ত পাখী পড়ন্ত বেলায়
আকাশের শূন্যে একা—শাদা দুটি পাখা
মুহূর্তের ছবি যেন স্তব্ধতায় আঁকা—
তখন বিস্মৃতি ছুঁয়ে রোমাঞ্চিত মনে
তোমার আহ্বান আসে প্রদোষ অঙ্গনে।
তোমার আঙুলগুলি আগুনের গান
বহুদূর সে-দিগন্তে তোমার আহ্বান।

সন্ধ্যার অরতী আলো মুছে যায় দেখি,
নিজেকে চিনি না যেন, একি সত্য, একি!
শিশিরে-শিশিরে রূপালি প্রদীপ জ্বালা
বাতাসে ভেসেছে নীল জোনাকীর ভেলা
এলোমেলো হাওয়া মন্থর হয়ে কাঁপে
উপরে আকাশ একেলা বিরহ যাপে।
বেতস বনের পাতাগুলি গায় গান—
বহুদূর দিগন্তের এসেছে আহ্বান।

হিম-ঋতু বিন্দু-বিন্দু শিশির ছড়ায়
সেই মুখ বিস্মৃতির স্বপ্ন-কুয়াশায়।
কত দ্রুত পদধ্বনি নিশ্বাসের ভাষা
আকাশের নিরুদ্দেশে। তবু ক্লান্ত আশা
চাঁদের মতন শুধু বারেবারে আসে
মনের এ-অন্ধকার বিবর্ণ আকাশে।

তাই আজ শিশিরের রূপালি আঘ্রাণে
তাই এই অগ্নিগানে তোমার আহ্বানে
নিজেকে চিনি না যেন। এ-অসত্য একি!
রাত্রির এ-অন্ধকার মুকুরেতে দেখি
কত স্বপ্ন শব হয়ে ভেসে-ভেসে যায়
মরা নদী পড়ে থাকে অন্তিম শয্যায়,
এক পাশে চিতা নিভে আসে, অন্য পাশে
চাঁদ ওঠে : স্তব্ধ মৌন অঘ্রাণ-আকাশে।

কোনো সেন্টিমেণ্ট্যাল মুহূর্তে

শেষবার
মিনতি আমার।
তোমার অজস্র দানে
তোমার সহস্র গানে
যে-মালা দিয়েছো উপহার
গোধূলি রক্তিম-ক্ষণে
চৈত্রের মহুয়া বনে
রেখে যেয়ো সেই উপচার।

পূর্ণিমার আলো দিয়ে আর গান দিয়ে
আমাকে বেঁধেছো যতবার
আমি বাঁধা পড়ে গেছি
সেকি শেষবার ?
মিনতি আমার শোনো-শোনো
জীবনের পাত্র থেকে
মৃত্যুর তমিস্রা থেকে
এই শাদা হাড়
ভরে দিয়ো কোনো উপহার।

এই দেহ একদিন
বহু আগে একদিন
হয়েছিলো গান আর কবিতা তোমার।
সে যখন ভস্ম হবে
জীর্ণ হবে তুচ্ছ হবে
তখন সে চলে যাক বিস্মৃতির অন্য এক পার—
শেষবার
এই কি মিনতি আমার ?

কোনো সেণ্টিমেণ্ট্যাল মুহূর্তে

আমার রক্তের মাঝে
শতাব্দী সঙ্গীত বাজে
দিগন্তের জ্বলে দীপশিখা,
বাতাস পেয়েছে কুল
স্নান করে কত ফুল
হৃদয়ের অন্তরালে একা।

তখন কোরো না ভুল
ঐ আলো ঐ ফুল
জেনো তারা যায় এক দেশে,
সে-দেশেতে তুমি নেই
সে-আঁধারে আমি নেই
শতাব্দী সঙ্গীত শুধু মেশে।

দিনান্ত

যে-সব সায়াহ্ন ভরে হৃদয়ের অনেক ভাবনা
জানালায় কুমারীর চোখের মতন হয়ে কথা কয়ে যায়
সেই সব মুহূর্তের শাদা পথে, আকাশের তলে
প্রথম প্রেমের কথা মুঠো-মুঠো তুলে নিয়ে বাতাসে উড়ায়
তারপর চেখে দেখে মনের মতন হোলো কিনা
অঘ্রাণ-শেষের দিনে, হৃদয়ের কুয়াশার জলে।

আরো এক কথা ছিলো। সব কথা হয়নি তো বলা
সে-কথা তোমার নয়, কার কথা তাই বসে ভাবি।
কী-যে কথা! আজ তার খোসা পড়ে আছে
ধানের রঙের মতো, দিনান্তের হলুদ কিনারে
ভেসে-ওঠা বার বার কারুর চোখের মতো বোবা।

রাত্রিগুলি একবার জ্বলে উঠে-উঠে
পউষ শীতের দিনে শিশিরের শাদা এক ঘ্রাণে
নিভে যায়। কতবার প্রেম আসে, ভুলে যায় মন
মুছে যায় কত মুখ সুদূরের তারার মতন।

হৃদয়ের কুয়াশার জলে সূর্য জ্বলে ওঠে
নরম মোমের মতো বিকেলের আলো কলকাতায়
আপেলের মতো লাল দিগন্তেকে সূর্য ঠোকরায়
তারপর রাত নামে। কেরানীরা ফেরে।
প্লেনের গুঞ্জন ক্ষণে-ক্ষণে।
পেয়ালায় তামাটে চা, তামাকের গন্ধ
আর আড্ডা জমে কবিতা-ভবনে।

গোধূলি

আমাদের মন হোলো অজগর সাপের মতন
রঙীন অতীত শুধু জীর্ণতর করে,
সুদূরপ্রসারী মেঘে বিকেলের নীলাভা ধারালো
দিনান্তের কিরণের স্বর্ণ উত্তরে।
সবুজ দূর্বায় কবে ছেয়ে গেছে মাটি
মনস্তাপে ক্ষণে-ক্ষণে কতদিন কেঁপেছি অন্তরে
প্রেম ছিলো, আজো আছে, জানি না কী খাঁটি—
অদৃষ্টের লৌহবেড়ি কালের যন্তরে।

একদা স্থাবর দিনে মেঘে শখ ছিলো
আজো আছে কিন্তু কই সেদিনের উদ্দাম কামনা?
রাত্রিজাগা-চাঁদ শুধু তারাদের ফেরি করে যায়
গান গায় আকাশের : অতীতের শবের সাধনা।

সহসা নিষ্প্রভ আলো তুষার উষ্ণীষে
সানুদেশে ঢলে পড়ে শীতল ছায়ার কলধ্বনি
অনেক যৌবনভরা পৃথিবীর অপরূপ দেহে
বেজে ওঠে নূপুরের কনক কিঙ্কিনি।

উপরে আকাশ দেখি নীলে নীল, কখনো সবুজ
স্তিমিত পশ্চিমখানি শৈশবের স্মৃতির মতন
মনে পড়ে।
মনে পড়ে বহুদিন সংক্রামিত আমার এ-দেহে
তবুও তোমার স্মৃতি গোধূলির রঙীন আগুন।

আঁধি

মরুভূমি মেঘ হয়ে এলো
আদিগন্ত অন্ধকার, বাতাসের রুদ্ধস্বর, আকাশ ঘোরালো।
কোটি-কোটি ধূলি-রেণু মুঠি-মুঠি তুলে নিয়ে ছড়ালে এখানে
তোমাকে চিনেছি আজ তাম্র অন্ধকারে, সুতীব্র এ-দিনে।
ধ্বনি আর সঙ্গীতের বসন্ত-উৎসব শেষে হে বিজয়ী বীর
রক্তের পতাকা তুলে উন্মত্ত আবেগে তুমি এলে আজ : আকাশ আবির।

শূন্য ক্ষেতে একবার ঊর্ধে চোখ তুলে
দেখি :
সৌখিন কৈশোর-রাগে সিক্ত নও,
একি !
দুর্দম কঠিন দিনে এলে তুমি আজ
ভাঙনের তীব্র সুরে উন্মত্ত আবেগময় অন্ধ নটরাজ।

দিগন্ত-মেখলা ছিঁড়ে হঠাৎ আহ্বানে কার ধূলি-ধূমকেতু
হয়েছো পাহাড়,
কনক-কিঙ্কিনী-ভাঙা ভূলুণ্ঠিত-শতাব্দীর
কম্পমান হাড়।
যাযাবর হে বৈরাগী তোমার সাধনা শুধু
বৈরাগ্যের নয়,
তুমি তো আনোনি মৃত্যু অন্ধকার অশরীরী
প্রেতছায়াময়।

তোমার পিছনে শত অশ্বের ধ্বনি
তোমার পিছনে বিপুল জীবন আছে
ঐ শোনা যায় অশনীর ঝন্‌ঝনি
স্তব্ধ বুকের অনেক অনেক কাছে।

আঁধি

তোমার পতাকা উদ্ধত নির্মম
জীবন-মৃত্যু তুচ্ছ করেছে জানি
ওগো নিষ্ঠুর ওগো বীর অনুপম
আকাশে বাতাসে তোমার বজ্রবাণী।
তোমার শিয়রে নতুন পৃথিবী জাগে
সবুজ ফসলে সূর্যের গুঁড়ো পড়ে,
কৃষক-বধূর ভ্রমর-কৃষ্ণ চোখে
আগামী দিনের মদির স্বপ্ন ঝরে।

মরুভূমি তোমার পতাকা
জলন্ত স্বাক্ষর শূন্যে, রক্ত ছবি আঁকা।
একাকার এ-পৃথিবী, সূর্যের পরাজয়, শেষে পলায়ন
মহাশূন্য ঢেকে দিলো বর্বর বিক্ষোভে শুধু, নিষ্ঠুর চুম্বন।
বহু বর্ষ পরে আজ এই রক্ত-ঝড় করেছি বরণ
সামনে স্ফটিক দিন, সোনালি আকাশ আর সবুজ জীবন

দুর্গম স্বপ্নের সিঁথি বেয়ে যত চাঁদ উঠে আসে
তাদের হারানো-কথা ধারালো চোখের চাওয়া, বাঁকানো ভুরুতে
শ্বেত স্নিগ্ধ সুগঠিত কটিতে উরুতে
অন্ধকার শব হয়ে ভাসে।

অন্ধকার রাত্রিগুলি কালো-কালো থাম।
দিনগুলি সারবন্দী জনতার মতো কলকাতার চালের দোকানে—
তারি মাঝে মন হোলো শরতের জলহীন মেঘ?

হাওয়ায়-হাওয়ায় শোনো পিশাচের তীক্ষ্ণ এক হাসি
দন্তহীন, জরদ্গব, লালসার লালাঝরা চোখ,
পৃথিবীর আলো-জলে বিষ ঢালে : ক্ষুধা সর্বগ্রাসী।

উদ্দাম মনের ক্ষেতে ফসলের রুগ্ন শয্যাগুলি
অন্ধকারে চক্ষুদান? মানুষের মৃত চোখগুলি।

সুতীক্ষ্ণ তীরের মতো কথাগুলি উড়ে চলে যায়
নিশ্চিহ্ন সে অন্ধকার, আকাশের শূন্য কারাগারে।
বিচ্ছিন্ন বন্ধুর মতো সূর্যাস্তের স্মৃতি ফিরে আসে
সবুজ ধানের শীষে, দিগন্তের অন্য এক পারে।

শালবন

হাজার কাজের শিকলবাঁধা মন
ভুলতে সেকি পারি ?
তবু তাকে ভুলতে হোলো আজ !
দীর্ঘ সবুজ শালের বনে আজ
শীতের আগে হাওয়ার ছড়াছড়ি ।

তোমায় আমায় যে-সব কথার বাধা
বেঁধেছিলো নানান্ ছলে এসে
ফেলে দিলুম অনেক পিছন পথে
দীর্ঘ সরল শালের বনে এসে ।

শরৎ রোদের ঝিকিমিকি পাড়
শালের বনে বুনছে মায়াজাল ।
আমরা দু-জন পাশাপাশি চলি
খেয়ালমতো খানিক কথা বলি
উড়ছে দেখি হলদে প্রজাপতি
উড়ছে মনের ঝরাপাতাগুলি ।

শিশির দিয়ে ভিজিয়ে দিয়ে গেছে
চাঁদের আলোর গতকালের রাত ।
সেই শিশিরে তোমার পায়ের ছাপ
তোমার পায়ে শিশির-ভেজা ঘাস ।
শাড়ির ভাঁজে চোরকাঁটাদের ভিড়
শালের বনে শীতের সোনার তীর ।

শালবন

শাল গাছেরা বিঁধছে আকাশখানি
নিজের মনে খুসির কানাকানি।
এইখানে আজ বন-ভোজনের পাল।
এইখানেতে কত সহজ মন!
চতুর্দিকে ঘাসের সমারোহ
একটা ঝিঁঝিঁ ডাকছে বহুক্ষণ।

কেমন করে এই বনেতে এলুম?
শালের বনে শরৎ রোদের পাড়।

সময়হারা

দেখি দূরে চেয়ে আগুন ধরেছে বিরাট মাঠে
চৈত্রের শেষে মাঝ-বৈশাখী দিনে
উদাসী আকাশ চেয়ে আছে কোন তেপান্তরে
মেঘের স্বপ্ন উত্তরে-দক্ষিণে।

জেনেছি জন্ম মাটির উপরে ঘাসের মতো
কোমলে-সবুজে দুকূল ভাসানো প্রাণের মায়া
কখনো বা ঝরে আগুনের ফুল, সোনালি শিখা
কখনো সুদূর একাকী চাঁদের উদাসী ছায়া।

বিকেলে দেখেছি শিশু-উৎসব সহর-মাঠে
সবুজ ঘাসের ফুল হয়ে যেন ফুটলো তারা
আলোতে-হাসিতে প্রাণে উচ্ছল বন্যা-স্রোতে
উপরে আকাশ শান্ত সুনীল সময়হারা।

প্রাণের সবুজ অপরূপ সাজে কী সমারোহ
দিকে-দিকে দেখি আয়োজন চলে তীব্র দ্রুত।
রাশি-রাশি ঘাস, মরে যাবে এরা শীতের দিনে
নবধারাজলে আবার সবুজ মেঘের মতো।

আরতি

শীতের সূর্যে কুমারী আবির মেখে
অলস মধ্য দিন,
আবেশে মধুর দীর্ঘ নয়নে আঁকা
ক্ষণিক খেয়ালী ঋণ।

সৌম্য পাহাড়ে সন্ধ্যা ছায়ার মতো
শুনেছি অনেক কথা,
তুলিনি তাদের সময় চিতার পরে ;
নিবিড় আত্মীয়তা

শীতের সূর্য অলস মেখলা যেন
নীবীবন্ধনী মিছে,
আকাশের মতো ইথর-জমানো হিমে
প্রস্তর হয়ে গেছে।

এখনো কি তুমি ফাল্গুন-দিন এলে
পলাশ রাঙাবে ? বল।
যৌবন যদি সাহসী দস্যু হয়
বন্যায় উচ্ছল,

তখনো আমার সৌম্য পাহাড়ে ঘেরা
সন্ধ্যার মতো দিন,
ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাবে তুষার-শিখর দেশে
দীর্ঘ চোখের ঋণ।

ছুটিতে শান্তিনিকেতন

শূন্যঝরা আলো দিয়ে বৈকালীপ্রাসাদ
সায়াহ্নের কারিগর গড়েছে অনেক,
রাঙা মাঠ জ্বলে ওই : সবুজ সুস্বাদ
আর নীল আকাশের ক্ষেয়াল ক্ষণেক।

মকরত মণিগুলি শরৎ আকাশে
নক্ষত্রসভায় তারা এনেছে চমক,
সান্ধ্যভ্রমণে যাই, তুমি আছো পাশে,
কথা বলি, চুপ করি, নিরানন্দ শখ।

মেঘগুলি সাঁওতালি স্বাস্থ্যে ঘনকালো,
চোরকাঁটা নড়ে, দূরে ট্রেন তো উধাও,
দু-চোখে কুড়িয়ে নিই স্বর্ণঝরা আলো
কথা বল, সেই কথা শুনেছি আগেও।

তালগাছ প্রৌঢ়ত্বের স্থবির প্রতীক
ঝিঁঝিঁদের ক্লান্তি নেই, জোনাকিও জ্বলে,
বিধুর হয়েছে সন্ধ্যা, (জীবন অলীক ?)
মজুরাণী সার বেঁধে দূর গ্রামে চলে।

এ-সম[illegible]বি আঁকে নীল ও সবুজ —
সামনেই ছুটি শেষ : লাল সিগন্যাল,
গেরুয়া মাটির [illegible]শে অযথা অবুঝ,
আত্মার দু-পাশে কাঁপে দুর্জয় খেয়াল।

আমাদের প্রথম পৃথিবী পথে চলো যাই ফিরে
চূর্ণ-চাঁদে গড়া পথ, হেমন্তের হলুদের তীরে
মাঝে-মাঝে পদশব্দ স্মৃতির চূড়ায়।
ফিরে চলো অসহায়
সময়কে মুখোমুখি রেখে
দিনান্তের ক্লান্ত পথে বিকেলের সূর্যালোক মেখে
যাযাবর স্মৃতি নিয়ে।
কত কাল পরে হয়ে গেলো
গানের সুরের মতো হৃদয়ের কলোচ্ছ্বাসে। আবার হারালো
তন্দ্রা-ম্লান বিকেলের শেষ চিহ্ন। অন্ধকারে একা
চূর্ণ-চাঁদে গড়া পথ। শস্য ক্ষেত। হলুদের রেখা।

তীর্যক বর্শার মতো তারি কথা ফিরে-ফিরে আসে
রক্তের সোনালি আশ্বাসে।
পাহাড়ের সারি বুঝি তরঙ্গের উচ্ছ্বাসের মতো
খুলে দেবে পথ এক দুর্নিবার ইচ্ছাকে অন্তত।
জনতার মাঝে মিশে তারি কথা মনে-মনে বলি
ছেঁড়া জামা, রুগ্ন মুখ, হতাশায় ক্ষণেক চঞ্চলি
নীলাভ অতল এক পাতালের স্নিগ্ধ অন্ধকারে
মৃত্যুর গভীর স্বাদে খুঁজে নেবে শেষবার তোমারে আ[illegible]।

আজ যদি গান শুনি বিদায়ের মতন করুণ
যদি জাগে হৃদয়ের সুগভীর প্রদেশে তরুণ
সূর্যের পদধ্বনি। থাকি যদি ঘনঘোর স্তব্ধ অন্ধকারে—
মহুয়া-বীথির তীরে জেনো আমি বার-বার চেয়েছি উল্কারে

আমার তির্যক পথে সময়কে মুখোমুখি রেখে
শিশিরের স্নিগ্ধতায় স্মৃতিচিহ্ন সঙ্গোপনে এঁকে
জেনো ফিরে যাবো।   মুহূর্তের এ-দেখার গান
তোমার আলোর বনে হঠাৎ নিষ্প্রাণ
অভ্রের মতন শুধু উঠে জ্বলে-জ্বলে
বেদনায় মৌনতায় যাবে মিশে কোনো এক গভীর অতলে।

তির্যক বর্শার মতো তারি কথা মনে-মনে শুনি
ফিরে আসে শীতের আঘ্রাণভরা সমুদ্রের শ্বেত পদধ্বনি।

প্রহরী

হে আমার নীল মন ! দূরে দেখো পুরানো কেল্লায়
মেঘছায়া ধূসর করুণ। কখনো সোনালি জেল্লায়
সূর্য আসে : মুহূর্তের উজ্জ্বল চুণকাম।
ঘন-ঘন ঢেউ হয়ে প্রান্তরের সবুজ প্রণাম।

আমাকে ছুঁয়েছে আজ মৃত্তিকার শিকড়ের রস
উচ্চস্বর ঘিরে আসে, দীপ্ত নেত্র, প্রচণ্ড রভস।
কেল্লার পুরানো আমেজ, অতীতের সহস্র কল্লোল
রূপসীর তীক্ষ্ণ চোখ, বৃদ্ধার শরীর বিলোল
অকর্মণ্য মূঢ়তায় শুনি যেন খঞ্জনি বাজায়
সহস্র-সহস্র দৈন্য : মূঢ় মূক ম্লান অসহায়।

প্রাণে আজ প্রাণ দাও, কানে দাও গাণ্ডীব টংকার
শত্রুর সগর্ব বুট যেন রোখে এ-বুক আমার।
হে আমার পার্শ্বচর অতীতের গরবী ভারত
দুর্জয় তোমার স্নেহে আমি হব সেই ভগীরথ
শঙ্খে গানে অগ্রগামী। পশ্চাতে অজস্র কল্লোল।
তীব্র সুরে বাজে প্রাণ, রক্তে দেখি সুবর্ণ অনল।

হে আমার তেপান্তরী মন
পুরানো কেল্লার পাশে তুমি হও সৈন্য একজন।

সায়াহ্নের স্তব্ধতায় আমি রিক্ত, উদ্দাম তবুও
মনে-মনে কথা বলি ব্যর্থতার গৌরবের গান
অশরীরী ছায়া যত ভীড় করে জানায় কামনা
কৈশোরের স্মৃতি নিয়ে ভারগ্রস্ত। ভয় অপমান
কতবার কৃষ্ণ ক্ষত সর্ব অঙ্গে এঁকে দিয়ে গেছে
বিষাক্ত ক্লেদাক্ত ছবি চেতনায়-অবচেতনায়—
হে প্রদীপ্ত সূর্য, তুমি সন্ধ্যায় সুবর্ণে উজ্জ্বল
দিনের কবরে তবু শুনি আমি মৃত্যুর আহ্বান।

এখানে ফুটেছে ফুল গন্ধে বর্ণে রঙীন আলোতে
উপরে আকাশ আছে নীল স্তব্ধ সমুদ্রের মতো
আমার কামনা দিয়ে আমিই কি রাঙাবো তাদের?
সন্ধ্যার নদীর তীরে অন্ধকার আসন্ন উদ্যত,
শবভুখ শৃগালেরা অট্টহেসে দূরে চলে গেলো
ক্লান্ত পাখী নেমে এলো, অরণ্যের অন্ধকার নীড়
নিশ্চেতন হিম-রাত অস্থিসার, স্বপ্ন এলোমেলো :
রাত্রির সন্ন্যাসী জাগে, হাতে পাত্র চন্দ্র-করোটির।

[illegible]মাকে চিনেছি আমি। আজ নয়, আগামী কালের,
শতথ[illegible]ড়ি ভেঙে ধাপে-ধাপে এসেছো এখানে।
সর্বাঙ্গের [illegible]স্ত্রে ক্ষত, রক্তাক্ত স্বেদাক্ত দেহ, মুখে
স্মিত হাসি। সুন্দর নিষ্ঠুর তুমি। জন্মমৃত্যুঞ্জয়।

লাইটহাউস

আবার পেছিয়ে যায় ধীরে-ধীরে আসন্ন সন্ধ্যায়
দূরে জল কৃষ্ণকায়, আকাশের অসীম শূন্যতা।
পড়ে থাকে স্বচ্ছ বালি মূক মুগ্ধ রাত্রির নয়নে
তারাদের গান আসে বিরহের শান্ত মৌনতায়।

আঁকা হয়ে যায় আজ রাত্রির নীরব শিশিরে।
তোমার চরণ-চিহ্ন বুকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে হাসে।
যা চেয়েছো একদিন পাওনি তো, তবু কি পাওনি ?
দেহের নীরব সৌধে, নীবীবন্ধে, আঁখির মুকুরে ?

তারপর অজস্র সোনালি গানে, বাতাসের দিগন্ত বিলাসে,
ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের মুখে, হতাশ্বাসে, কখনো বিষাদে,
একে-একে মোছো আঁকো, ক্ষান্ত-বর্ষা মেঘের মুকুটে
মুহূর্তের পূর্ণপাত্রে, আপনার অনন্ত নির্যাসে।

ফিরে আসে ধীরে-ধীরে মনের মায়াবী স্ফটিকে
পরাগ-জড়ানো পায়ে অরণ্যের দুরন্ত ভ্রমর,
দুর্নিবার মুহূর্তের হলুদ ফসলগুলি
ফিরে আসে বারবার, ঘিরে থাকে দেহকে কটিকে।

নক্ষত্রসংকেতেভরা সচেতনতায়
ছোটো-ছোটো আলো জ্বলে, নেভে আর জ্বলে।
তোমার পাঠানো ঢেউ ফিরে আসে, ভাঙে
জাফরানে-কুম্‌কুমে-ঘুমে। আবার পেছিয়ে যায়।

ঐকতান

মৃত্যুর শিখার সঙ্গে সমুদ্রের ঐকতান বাজে।
আমার হাজার কাজে
হানা দেয় অসংখ্য মিছিল—
রঙ তার জানা নেই। রঙ এই মনে নেই। যে-চিল
উড়েছে অদৃশ্য লোকে
ডানা মেলে পাখার ঝাপটে, যে-আবির সন্ধ্যার বিধুর চোখে
শূন্যতাকে আঁকে যত্ন করে—
মৃত্যুর শিখার সঙ্গে তারি এক প্রশান্ত ঝঙ্কার শুনেছি অন্তরে

এ-জীবন নিয়েছো কি কেড়ে ?
সাড়া নেই তারালোকে। অন্ধকার দুই হাতে ছিঁড়ে
ভাষাহীন ক্লান্ত সুরে ফিরে আসে মনের দেয়ালে
ফিরে আসে মাটির সবুজে আর ভাঙা-ভাঙা আলে।

তোমার কপালে কবে রক্ত-রেখা আঁকা হয়েছিলো!
বোলো আজ দূরাগত প্রতিধ্বনি প্রাণ ভরে বাসে তাকে ভালো
অন্য এক দেহহীন সুরহীন প্রতিধ্বনিখানি :
রণ্য-মর্মর আর সমুদ্রের শূন্যস্বর জানি।

খা [illegible]

এ-জীবন ছায়াময়। বৃষ্টি-ঝরা বিনম্র সন্ধ্যায়
বাসে-ফেরা কেরানির ক্লান্ত স্তব্ধতায়
চৌরঙ্গির পশ্চিম আকাশে
মেঘে-লাল সায়াহ্নের অন্য এক সঙ্গীহীন পাশে
সময় রয়েছে শুয়ে।
আলস্য-জড়ানো তন্দ্রা তার ক্ষীণ কটিখানি ছুঁয়ে।

সেইখানে যদি ফের দেখা হয়ে যায়
মনের অরণ্যখানি ফের যদি অব্যক্ত কথায়
রোমাঞ্চিত হয়ে আঁকে আগামী দিনের
বসন্ত-উৎসব শেষে সুনীল স্বপ্নের
সমুদ্রের ঐকতান মৃত্যুর শিখায়—
এ-জীবন শেষ কথা উড়াবে হাওয়ায়।

অনেক চাওয়ার মাঝে কোনো পাওয়া এতোটুকু নেই
রাত্রির আকাশ-ভরা তারার কামনা শুধু পায় মৃত্যুকেই।

আসমানি

দম নিই। তেতলার শেষ সিঁড়িখানি
এখানে থেমেছে। জানালায় আসমানি রঙ,
চৌকো আকাশ।
পাতার মর্মর—নীল—সমুদ্র আভাস ।

সূর্য গিয়েছে চলে, আবার হেমন্তে
গানের কলির মতো ফিরবে।—সাড়ে ছয়—সন্ধে।
মন্দির দেউল নয়, হৃদয়ের স্রোত শুধু বাজে
নানা সুরে।—না-না, আসা হয় কাজে ।

দম নিয়ে ভাবছি, কেবলি ভাবছি,
মনে-মনে আউড়ে নিই : এই যে, কেমন আছো ?
(শার্শিতে নীল একটা মাছি ।)
আবার হারিয়ে যায়। রেশমের মতো এই আলো
সন্ধ্যার মিনার বেয়ে কেঁপে-কেঁপে উড়ে যায়।
                    একদিন (মনে আছে ?) ভালো
বেসেছিলে ? মন দিয়ে, দেহ দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, আর—
যাক, কী দরকার, সে-কথা কইবার ?

[illegible] সিঁড়ি ভেঙে খানিকটা হাঁপাই
দূরে [illegible] স্তা : ট্রামের স্পষ্ট শব্দ পাই।
মাছিটা গিয়েছে উড়ে, জানালার চৌকো আকাশে
খেয়ালি আসমানি রঙ একান্তই মুছে-মুছে আসে।

দম নিয়ে আবার হাঁপাই।
কাজ কি দেখায় ? কাজ কী ? পাই কি না-পাই।
ফিরে চলি।
মনে-মনে কী যেন চেষ্টা চলে। বলি :

আসমানি

তোমার চোখের চেয়েও আরো ধূর্ত আছে
চৌকো জানালার পাশে,
বর্ষার সুগন্ধের কাছে,
বিবেকের পাশেও হাঁটে না
এ-জীবন জেনেও জানে না।
নির্বিকার অতিশয়
সে—সময়।

উপরের দরজা খুলে যখন আসবে
অন্ধকারে আসমানি রঙ নেই : কে যেন কাশবে।
শ্রাবণের নারকেল পাতায় মর্মরিত বিহ্বলতা
সমুদ্রের অসীম শূন্যতা
সময় বাজাবে একতারা
সিঁড়ি দিয়ে কত মুখ উঠে আসবে ! কারা ?

তারা আর কেউ নয়
তোমারই অনেক ছবি। সময়ের অপব্যয়—
তবু তোমাকে গড়েছে কৈশোরে, যৌবনে
আবার বানাবে বার্দ্ধক্যে-জরায়। অন্ধকার শোনে
প্রতিধ্বনি।
আমি তখন কোথায় ? এই যে শেষ সিঁড়ি।
বাইরে আকাশ—রঙ, নীল আসমানি।

কলকাতার অবাক একটি মুহূর্ত

কলকাতার পথে যেতে-যেতে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম
সিকি-আধুলি নয়—একটি মুহূর্তকে !
কলকাতার পথে পেয়েছিলাম—
যখন শেষ-সন্ধ্যার মেঘগুলোকে
হঠাৎ বলগা-হরিণ বলে মনে হয়েছিলো,
রাস্তার সবে-জ্বলা আলোগুলোকে মনে হয়েছিলো
চোখের করুণ মিনতির মতো ।
কলকাতার পথে হঠাৎ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম
সেই অবাক একটি মুহূর্ত ।

সেই একটি মুহূর্তে যেন কুড়িয়ে নিলাম সমস্ত জীবন
মনে হয়েছিলো
গভীর অরণ্যের ভয়ঙ্কর মৌন গান বুঝি শুনতে পাবো
মনে হয়েছিলো
রাত্রির কালো সমুদ্র-কল্লোল বুঝি পাবো শুনতে ।
মনে হয়েছিলো
এই মুহূর্তের সিঁড়ি দিয়ে বুঝি নেমে যেতে পারবো
[illegible]ীর স্বচ্ছ চেতনায়,
যেখা[illegible]রের দেবতা ধুয়ে দেবে মৃতদেহের স্মৃতি
আলোর [illegible]বতা দেবে নতুন প্রাণ
শেষ-সন্ধ্যার বলগা-হরিণ মেঘের মতো ।

কলকাতার পথে যেতে-যেতে
[illegible]ই অবাক মুহূর্তকে পেয়েছিলাম,
[illegible]ন্দির গাত্রে খোদাই-করা মূর্তির মতো এই মুহূর্ত ।

সেই মুহূর্ত শুয়েছিলো ভিখিরির মতো
তার শিয়রে টিনের পান-পাত্র
তার গায়ে ছেঁড়া-চটের আবরণ,
তার চোখ ছিলো বোজা, দেহ ময়লা, চুলে জট।
কিন্তু যেই তাকে স্পর্শ করলুম
সে হেসে উঠলো,
সে চাইলো অবাক দৃষ্টিতে,
মায়ার মতো মিলিয়ে গেলো তার ছদ্মবেশ।

আশ্চর্য!
কী করে চিনেছিলুম তাকে ?
বাড়ি ফেরার পথে কেবলি আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলুম :
কী করে চিনেছিলুম সেই অবাক মুহূর্তকে
ছাই-চাপা মণির মতো যে লুকিয়েছিলো

সেই মুহূর্ত আমাকে দিয়েছে অটল বিশ্বাসের বর
তারপর
আবার হয়তো ছদ্মবেশে শুয়ে আছে
কোনো গলির মোড়ে
কোনো ফুটপাথের কোণে
কোনো গাড়ি-বারন্দার তলায়।

হয়তো অপেক্ষা করছে
যখন সমস্ত জনতা তাকে একদিন কুড়িয়ে নেবে

ফুটপাথে থেমে আসি এক মনে খুঁজি ফাঁকা ট্রাম
হকারের হাঁক শুনি : তাজা খবর, অসংখ্য গ্রাম
পুড়ে-পুড়ে ছাই হোলো। এক আনা দাম!—তারপর
হেমন্তের সন্ধ্যা দেখি, আকাশের প্রশান্ত প্রহর।

এ-সৌন্দর্য সত্যি নাকি? কেনই বা সত্যি এটা নয়?
পকেটের পোড়া বিড়ি, নীল সন্ধ্যা : অপূর্ব বিস্ময়।
আপেলেতে মাছি বসে, চুলের জরির শাদা ফিতে
মারাঠী মেয়েটি থামে, নিচু হয় সেটা তুলে নিতে।
উঁচু বাড়িটার পাশে ক্ষণিকের এই নীল মায়া—
ধোঁয়াটে গ্রামের পাশে মরা-মুখ আর আবছায়া।

পা যে চায়না চলতে, কাকে খুঁজি, পাই কি না-পাই!
বাজারের জনতায় আবার হারিয়ে বুঝি যাই।
দেহের নীচের মনে, মনের নীচের অন্ধকারে
এলোমেলো বহু শব্দ ভেসে-ভেসে আসে বারেবারে!
তারা ছিলো একদিন, তারা ছিলো একদিন পাশে
তাদের চোখের দৃষ্টি ধরা পড়ে সন্ধ্যার আকাশে।
এই নীল মৌন গানে তাদের স্পন্দন শোনা যায়—
[illegible] কেউ ছাই, আলো হয়ে কেউ বা হারায়।

তারা ছিলো একদিন। স্মৃতিখানি ক্ষীণতর হয়ে
উড়ে যায়, ভেসে যায় মেঘের মিনার দিয়ে-দিয়ে।
তবু তো যায়নি তারা, আমাদেরি পাশে জেগে থাকে,
কিংবা থাকেনা কেউই, সময়ের শিল্পী শুধু আঁকে
শিশুর গভীর মায়া, সায়াহ্নের নীল ছায়াখানি
এখনো রঙীন পটে ছবি হয়ে মুছে যায় জানি।

বাজার

আমি ক্লান্ত অভাজন ধীরে-ধীরে চলি ঘরে ফিরে
মনের দেয়ালে আঁকি অসংখ্য মুখের ছবি নোখ দিয়ে চিরে।
স্মৃতির ভাণ্ডারে শুধু পুরু হয়ে ধুলো জমে থাকে
সেখানে হারাই পথ, চলেছে হাজার রথ, খুঁজি তবু কাকে?

ধুলো

ধানের রঙের মতো হেমন্তের রৌদ্র-ভরা বিকেল
এতো আলো, এতো আকাশ, এতো প্রাণ
সবটা মিলিয়ে পরিপূর্ণ একটি ফলের মতো মনে হয়।
সবচেয়ে অবাক লাগে যখন মনে করি
আমি বেঁচে আছি, আমি দেখছি, আমি ভালোবাসছি।
অবাক লাগে ভাবতে : একদিন এদের আমি দেখিনি,
একদিন এদের আমি দেখবো না।
এতো আলো, এতো আকাশ, এতো প্রাণ
ধানের রঙের মতো হেমন্তের রৌদ্র-ভরা বিকেল।

একদিন আমি এদের পাবো না।
কিন্তু একদিন যে এদের পাবার আনন্দ
আমার মনের মধ্যে বিন্দু-বিন্দু সঞ্চিত হয়েছিলো
—তাদের রেখে গেলুম, ছড়িয়ে দিলুম
গ্রামের সোনালি ধুলোর পথে।
তামাটে পায়ের ফাটা-চামড়ার চাপ
এই আনন্দকে জীর্ণ করুক।
শিশু খেলা করুক এই ধুলোয়,
মা[illegible]লের আর হেমন্তের শিশিরের গন্ধ
ছড়িয়ে[illegible]ক এই সোনালি পৃথিবীতে—
বাংলা দেশের এই আশ্চর্য ধুলোয়।

হেমন্তের এই আলোর বন্যাময় শান্ত বাংলা দেশের গ্রাম
[illegible] দূর দেখা যায় সোনার ফসল
[illegible]ঠের উপর স্তবের মতো নুয়ে পড়েছে
[illegible]ান্ত নির্বাক সূর্যের উষ্ণ-কোমল স্পর্শ

ধুলো

একটু ঠাণ্ডা বাতাস বইলো
বাঁশবন সির-সির করছে
একটা ফড়িং লাফিয়ে চোর-কাঁটার বনে অদৃশ্য হোলো
আকাশে শঙ্খচিল—
হঠাৎ দূরের মাঠ চিরে কালো মাল-গাড়ি চলে গেলো

হেমন্তের পরিপূর্ণ পড়ন্ত বেলায়
কী নিরর্থক ভাবা :
একদিন ছিলুম,
একদিন থাকবো না।

আমরা

আমরা অনেক হীরা-জ্বলা নীল ক্ষেতে
রাতের শিশিরে প্রজাপতি-ডানা পেতে
মিশেছি, হেসেছি, পেয়েছিও ভালোবাসা—
শিকারী শকুন উড়ে-উড়ে আসে : এক চোখে জিজ্ঞাসা।

সেই হীরা-জ্বলা রাতের নীলাভ ক্ষেত
পড়ে আছে দেখি : ধান কেটে নিয়ে পালায় একটি প্রেত
দুই চোখে তার নরকের আলো, ঠোঁটে লালসার হাসি—
আমরা চিনেছি, মিশেছি, পেয়েছি, চলেছিও পাশাপাশি।

আমরা চলেছি। দেখেছি আগুন কার চিতা যেন জ্বলে
মায়াবী নদীটি বেঁকে চলে যায় আকাশের কালো কোলে।
ফাল্গুন মাসে বাতাসে-বাতাসে বনভূমি সিরসিরে
কুমকুম ঢেলে পুরানো এ-চাঁদ আবার এসেছে ফিরে।

আমাদের মন হীরা-জ্বলা ক্ষেত। আমরা জেনেছি তাকে
ছিন্ন করেছি বহু শতাব্দীর মেকি আবরণটিকে।
শি[illegible] মাটির স্পর্শ ছেয়েছে পুরানো দেহ
আগামী[illegible]র গানের কলিতে ঘনীভূত নীল মোহ।

আবার অঘ্রাণ

আবার অঘ্রাণ এলো, আর সেই রাত
নীলাভ চোখের মতো জ্যোৎস্নার প্রাসাদ।
কালো ভ্রমরের গানে মনে হয় দূর থেকে যেন
ব্যাকুল হয়েছে সিন্ধু উচ্ছ্বাসে সফেন।
গোধূলি পাণ্ডুর ক্ষণে ক্লান্ত আকুলতা
মনে পড়ে রূপালি অঘ্রাণ মাসে ভুলে-যাওয়া কথা।

তবু আজ চিনেছি তোমাকে আমি শুক্তির মতন
সমুদ্রকে বাদ দিয়ে একটি প্রবাল যেন জীবনের এই রিক্ত ক্ষণ,
কী পেয়েছি, পাই নি কী—আজ তার হিসাবের খাতা
খোলা হয়ে পড়ে আছে। মনের কবিতা
তাই নিয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরি দিনে-দিনে
শুধু আজ অঘ্রাণে-আশ্বিনে
প্রথম শীতের হাওয়া হাড়ের ফুটোয় বয়ে যায়
আর মনে হয়
এ-জীবন পরম বিস্ময়।

একদিন তুমি ছিলে, ছিলাম আমিও,
কেউ আর নেই আজ, অঘ্রাণ তবুও।

প্ল্যাটফর্মে

নিজেকে নিজেরি ভয়
অসীম শূন্যতায় কণ্ঠরোধ হয়ে আসে।
এসেছি সোয়া সাতটায়। জংসন স্টেশন। জিলিপি আর ফুলুরি।
ভাঁড়ে চা, চিনেবাদাম, ঝাল পান, জোলো দুধ এক খুরি
—শ্রীহরি
রাত্রি বারোটার প্যাসেঞ্জার ধরবো। ততক্ষণ কী করি ?

একদিন শখ ছিলো আকাশের মেঘে,
শরতের প্রথম নেশায় রেলগাড়িতে উধাও হবার
কল্পনাও ছিলো।
হায় আমাব ভাগ্যরথের ঘোড়া
টগবগিয়ে এনে ফেললে পচা এক জংসন স্টেশনে
যেখানে সোয়া সাতটায় নামতে হয়
যেখানে রাত্রি বারোটা আর বাজতে চায় না।

হায় নাম! কয়টি অক্ষর শুধু, ধ্বনিময় ক্ষণিক বিষাদ
আলোকস্তম্ভের মতো নিতান্ত একাকী এক সমুদ্রের স্বাদ
পেলাম তোমার কাছে। রাত্রির নিভৃত দেশে এলে সঙ্গোপনে
দ্যূত-ক্রীড়া শেষ হলে মায়াবী অরণ্য ভরে হৃদয়ের নির্জন অঙ্গনে।
পিঙ্গল গাছের পাতা নিঃশব্দে পেয়েছে মাটি, মৃত্যু অবিরাম,
তোমার সায়াহ্ন ভরে কত মেঘ ঝড় তোলে মোছে সব নাম।

হায় নাম। পথে-পথে ক্ষত-দগ্ধ ক্লান্ত মুখ বারবার দেখি
জনতার এক কোণে সায়াহ্ন-সূর্যের তাপে মন ভরেছে কি?
এ-জীবনে স্বাদ নেই, মনের অরণ্যে মৃত রক্তহীন চাঁদ
নিঃশব্দ স্মৃতির হ্রদ, ক্ষণিক পাণ্ডুর আলো, বিবর্ণ প্রাসাদ।
নিরর্থক চেয়ে থাকা। চোখের সমুদ্রে ওঠে কঠিন তুফান—
লাসকাটা ঘরে-ঘরে মাকড় রূপালি জালে লেখে এক নাম।

হায় নাম। অশথের নবপত্র দগ্ধ হয় সবুজ আগুনে
দক্ষিণা বাতাস ক্লান্ত, রাত্রির স্ফটিক তারা নিরর্থক গুণে।
বুঝি আজ যেতে চাই যেখানে পাহাড়ে এক আছে নির্ঝরিনী
নির্জন সকাল আর নির্জন সায়াহ্ন ভরে মৃদু কলধ্বনি।
হঠাৎ চমকে ভাবি: সেখানে একাকী নও, জ্বলে অনির্বাণ
প্রেতের ছায়ার মতো পিছনে দাঁড়ায় এক রক্তহীন নাম . . .

১৯৪৭-এর ছড়া

(ছোরা নয়)

আজ সহরে হাহাকার
সন্ধে থেকেই বন্ধ দ্বার
অন্ধকারে ছুরির শান
কান্তিবাবু শুনতে পান
ধূর্ত চোখ ও তীক্ষ্ণ কান—
হায়রে হায় কে বা কার !
আজ সহরে
সাঁঝ পহরে
মত্ত হাওয়ার হাহাকার।

আজকে কেন ক্ষিপ্ত লোক ?
জ্বলছে কেন রক্ত চোখ ?
মানুষ কাটো বাংলা কাটো
ভারত করো খণ্ডিত,
বলছে হিরু, বলে সিরাজ,
বলছে মূর্খ পণ্ডিতও।
হায়রে হায় অন্ধকার
সন্ধে থেকেই বন্ধ দ্বার
সব ভুলেছি কে বা কার
হাঁকে কসাই রক্ত চাই—
ভাই মরেছে মা মরেছে
কোথায় আরো রক্ত পাই ?

পুনরুজ্জীবন

(সুকান্ত ভট্টাচার্য-কে)

সর্বদা শঙ্কিত মন ক্ষুদ্র স্বার্থ আস্ফালন করে
কুণ্ডলি পাকানো সাপ ফণা তুলে প্রতি ঘরে-ঘরে।
মানুষের মানে নেই, কৃষ্ণচূড়া স্মরণ জাগায় :
রক্তাক্ত শাণিত ছুরি ছিন্নভিন্ন করে জনতায়।

হঠাৎ খবর পাই, কোলাহল স্তব্ধ হয়ে আসে
বৈশাখের দগ্ধ দিন কাঁপে যেন উত্তপ্ত বাতাসে।
যাদবপুরের মাঠে শিরিষের ছায়া দীর্ঘ হয়
বেলা পড়ে আসে, দেখি ঝড় আনে পরম বিস্ময়।

আজকে দাঙ্গার নীতি, কীটজীর্ণ বিবর্ণ জীবন
কিশোর কবির মৃত্যু, দীর্ঘশ্বাসে ভরা প্রতিক্ষণ।
ক্লান্তি আর অবসাদ অন্ধকারে ঘোরে চতুর্দিকে
জীবন-যৌবন সব রঙহীন অবাস্তব ফিকে।

অকস্মাৎ মনে হয় মেঘে মিশে নবধারাজলে
তোমার চিতার ছাই রাশিরাশি সোনার ফসলে
ঝরবে বাংলার ক্ষেতে, মজুরের কৃষকের গানে
আবার বাঁচবে তুমি এ-মাটির উদ্দাম আহ্বানে।

করোগেটের ছাত, নিমের ডাল আর দেবদারুর ফাঁক দিয়ে উত্তর-পশ্চিম কোণের খানিকটা আকাশ আমার অনেক দিনের চেনা। শরতের গোধূলিতে আজ কামরাঙা রঙের রোদ্দুরের রাজসভা। একটি শাদা মেঘ বহুক্ষণ থেকে প্রাসাদ তৈরি করছে, তার চারিদিকে গভীর গাঢ় নীল, সে-নীল নেশার মতো, খুসির মতো যেন পেয়ে বসে।

প্রবাস থেকে ফিরে স্যুটকেস আর বর্ষাতি নামিয়ে ঘরের চাবি খোলার আগে কতবার পিছন ফিরে চেয়েছি। সেই লাল করোগেটের ছাত, সেই নিমের ডাল, সেই দেবদারুর কম্পিত শাখা আর অনেক দিনের চেনা অথচ সম্পূর্ণ নতুন একটি আকাশ উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে আমাকে অভ্যর্থনা করেছে।

এসেছে, এসেছে বৃষ্টি, শ্লেটের রঙের মতো সমস্ত আকাশ মৃত। জানি এ-মেঘ চিরস্থায়ী নয়। চিরকাল থাকবে না শ্লেট রঙের বর্ষা, কিন্তু তাদের পিছনে অনন্ত কালের খুসি নিয়ে একটি আকাশ অপেক্ষা করছে আমার জন্যে, বাংলা দেশের আশ্চর্য আকাশ, সেখানে কামরাঙা রঙের রোদ্দুর, সেখানে নব-নব দুরাশার অভিযান, সেখানে গাঢ় নীল খুসি।

একা

তিন দিন তিন রাত্রি বৃষ্টির পর
ধবধবে রোদ্দুর।
শরতের নীল। মন যায় কদ্দুর!
তিন দিন তিন রাত্রির পর।
হয়তো কত দিন কেটে যাবে
মেঘ হবে পাহাড়ের চূড়ো
হয়তো কতদিন যাবে কেটে
তারা হবে পাহাড়ের ফুল
হয়তো কেটে যাবে কত দিন
কত শত দিন।

দাঁতে দাঁত চেপে
ট্রামের ভিড়ে চলেছো।
অনেক দিন পরে দেখা, কী এনেছো?
রায়বাহাদুর বাজার করে বাহাদুরি কেনেন
সবকিছু সঠিক চেনেন
চকচকে মরা ইলিশ থেকে আঁশটে জল ঝরে
অনেক দিন পরে
দেখা। কী এনেছো?
এক ঝাঁক রজনীগন্ধা ঐ লোকটার হাতে—
একটু জায়গা চাই ট্রামের পা-দানিতে।
পা মাড়ালো, জামা ছিঁড়লো, তবু চলেছো।
আজকের হঠাৎ-উজ্জ্বল বিকেলে কী এনেছো?

গান্ধীজী কি ম্যাজিক জানেন?
স্বাধীন হয়ে কী পাচ্ছো রণেন?

একা

মরা দেশ মরা মানুষ ফেলে পালালো ইংরেজ
গান্ধী টুপি আর মুসলমানী ফেজ
স্টার্লিঙের দেনা
রাজকন্যের বিয়ের যৌতুকে দিয়েই দে না!
লাটের বাড়িতে স্বদেশী নিশেন
বুকটা কাঁপছে নাকি, রায়বাহাদুরি পেনসেন
হঠাৎ না ঘোচে।
তিন দিন তিন রাত্রির পর সূর্য চোখ মোছে।
হঠাৎ শরতের নীল
হিন্দু-মুস্লিম মিল
—উঃ, ভিড়টা কমলে বাঁচি
পকেটমারের কাঁচি
ইনফ্লুয়েঞ্জার হাঁচি
[illegible]ন দিন তিন রাত্রির পর
[illegible]শাদা রোদ্দুর
টালিগঞ্জ কদ্দুর?

কী এনেছো তিন দিন তিন রাত্রির পর
কী এনেছো?
এনেছি শরতের খুসি, এনেছি আকাশের নীল।
(যত সব বাজে কথার ভুষি)
[illegible]র নতুন স্টুডিবেকার
[illegible]ার
[illegible]ক নিয়ে তার স্বামী চলেছে আমেরিকা—
[illegible]দিন তিন রাত্রির পর

তারপর
কী এনেছো ? কী এনেছো ?
এনেছি শরতের খুসি, এনেছি রৌদ্রের শুভ্রতা—
কী সব ফাঁকা বুলির কাব্যিক কথা !

কিন্তু কী চাও ? কী চাও বলবে ?
সময়ের বালি ঝরবে, যৌবন মরবে,
সংসার চলবে।
আরো কী চাও বলবে ?

বিকেলের রোমান্টিক আড্ডার পিঠে বুদ্ধিজীবী সহিস
চিঁড়ে-ভাজা চা সহযোগে পিকাসো-মাতিস
কিংবা ফিফ্‌থ্‌ সিম্ফনি
মৃদু টিপ্পনি
বুঝেছো পলিটিক্যাল ফাঁকি
মিরাক্যল না হাতি, গান্ধী নেহাৎই লাকি।
কলকাতা আশ্চর্য সহর
ঠিক প্যারিসের পর।
হায়, জানি না প্যারিস কদ্দুর
এখানে নেহাৎই দেশী রোদ্দুর।

তিন দিন তিন রাত্রির পর
আর কী চাইবে ? কিংবা পাবে ?
অল্প-অল্প চিঁড়ে-ভাজা খাবে।
আলমারিতে ফরাসি বই
ইনটেলেকচ্যুয়াল মই

একা

মাঝে-মাঝে চেরি ব্র্যাণ্ডির ফাঁকে
কয়েকবার বিপ্লবের কথা হাঁকে
কিছুতেই কিছু হয় না,
বাঁধা বুলির ময়না
আকাশের আশ্চর্য রোদ চোখে সয় না।

তিন দিন তিন রাত্রির পরের বিকেল শেষ হোলো
আবার হাওয়া বইছে জোলো।
মেঘ জমছে
হয়তো বৃষ্টি নামবে
কণ্ট্রোলের ছাতাটা কই ?
আর পুরনো বই—

[illegible]ছে। সত্যিই মেঘ জমছে
সত্যিই বালি ঝরছে
রাত দশটার ট্রাম বেশ ফাঁকা
একা। ফিরছি একা।

বিকেলের নদী

১

বিকেলে আশ্চর্য আলো। সূর্য-দগ্ধ কালো-কালো দীর্ঘ-দীর্ঘ পথ
সহরের হৃৎপিণ্ড রক্তাক্ত নেশায় স্তব্ধ, মৃত্যুর শপথ।
মৃত্যু-ভয় উর্ণা-জালে জীবনের চতুর্দিকে জটিল পাহারা
ট্যাক্সিতে অপ্সরা-ওড়া রাত-জাগা চৌরঙ্গির আজ কী চেহারা!

জানি আজ গানে মানে নেই
শঙ্কাতুর মন ভয়ে অচিরে পাবেই
পরিচিত মৃত্যুর আঘ্রাণ
যৌবনের পান-পাত্র চূর্ণ খান-খান।

রুদ্ধশ্বাস জনতায় ঊর্দ্ধশ্বাস কর্দমাক্ত দেহ
স্থলে-জলে একাকার। কানে-কানে বলে গেল কেহ:
কুকুর-ভিক্ষুক জমে বড়-বড় গাড়ি-বারান্দায়
মৃত্যুকে ঘনাতে দেখি অনর্থক মত্ত ব্যগ্রতায়।

২

লালসার লোল গর্ভে জানি আমি নেই কোনো ক্ষমা
জীবন সমাধি পায় আরণ্যক যামিনী ত্রিযামা।
শরতের কাশবন মেঘ হয়ে যেন উড়ে যায়
বিন্দু-বিন্দু বৃষ্টির ফোঁটায়
গুচ্ছ-গুচ্ছ হীরের ফসলে
মোটরের শাদা কাঁচ অকস্মাৎ জ্বলে।
তারপর মাঠ।
মাঠ আসে সবুজ উদ্দাম ঘাসে।
মুহূর্তের মধ্যে তা-ও মুছে যায় শ্রাবণ-আকাশে।

নির্জনতা দিয়ে শুধু বারবার নির্জনতা গড়ি
ঝিঁঝিঁদের আর্তনাদে ভগ্নপাত্রে মুক্তি ভিক্ষা করি।
সূর্যরশ্মি দেখি ঝরে কালান্তক রক্তাক্ত বিকেলে
বাঁকানো ছুরির স্বাদে বলো তুমি আরো কী-কী পেলে?

যদি সেই নদীখানি এই তাম্র ত্বক চিরে প্রবাহিত হয়
চেতনার বন্ধ দ্বারে চাঁদ এক উঠে আসে, আলোয়-আলোয়
আমাদের রাহুমুক্ত মন,
হয়তো তখন
গান হবে অর্থময় হেমন্তের ফসলের মতো
বাঁকানো ছুরির স্বাদ সেই দিন ভুলবো অন্তত।

৩

বৈশাখীর মেঘ সন্ন্যাসীর জটা
আগুনের দীর্ঘ সাপ বিদ্যুতের ছটা।
বৃষ্টির আগের ঝড়ে লবণাক্ত দেহ
বারে-বারে পেতে চায় গভীর সস্নেহ
শ্যামল মসৃণ স্পর্শ। প্রলয়ের গানে
যৌবনের পাত্র পূর্ণ মৃত্যুর আহ্বানে।
তখন স্মরণ করি : অবশেষে যদি
ফিরে পাই রৌদ্র-রাঙা বিকেলের নদী।

অরণ্য আছে শ্বাপদ-সঙ্কুল
প্রলয় আছে। আফিমের ফুল
[illegible]হি আর নেশা দেয়, ভালোবাসা নেই—
[illegible]রের ভাঙা-হাড়ে ঘুণ ধরছেই।

রৌদ্র যদি মেঘ হয়, মেঘ হয় পাহাড়ের মতো
মৃত্যু যদি জন্ম হয়, জন্ম হয় জীবন অন্তত।
রৌদ্র-রাঙা নদী যদি ঘন নীল দিগন্তে মিলায়
ধারালো বঙ্কিম ছুরি ভুলে যাবে রজনীগন্ধায়।

৪

কী আছে আশ্বাস ?
ট্রাম থেকে নেমে ভাবি বড় জোর তাস।
বন্ধ ঘরে ধূর্ত চোখ, জোরালো আলোয়
কখনো বা মিটমিটে। কখনো শিরায়
জ্বালা ধরে। কখনো কি পাবে তাকে ফিরে ?
যে-জীবন চলে গেছে, হঠাৎ শিশিরে ?

শান্টিঙের শব্দ শোনা যায়
মিটমিটে আলো জ্বলে, পৃথিবী ঝিমায়
ক্লান্তির গামছা পেতে কয়েকটি হাটুরে
মাঝ-রাতে প্যাসেঞ্জারে যাবে কিছু দূরে।
তারপর হয়তো বা ঝিঁঝিঁ-ডাকা গ্রাম
কী জানি কী নাম।
মাঝেমাঝে কখনো শেয়াল ডাকে
রাতচরা পাখী আর পাহারালা হাঁকে।
তারা থেকে হয়তো শিশির ঝরে
পাতা নড়ে।

বিড়ির লালচে মাথা এক কোণে মাঝে মাঝে জ্বলে
বুক-ভাঙা কাশি আর ঘুম-ভাঙা তারা টলটলে।

চা খাবে? (নিজেকে প্রশ্ন) ভাঙা আর ফাটা পেয়ালায়
অথবা মাটির ভাঁড়ে গুড় গুলে? (চিনি নেই হায়)।
ঝিমন্ত অস্পষ্ট লোক কাঁপা-হাতে-গরম চা ঢালে
(এরি মতো কেউ বুঝি ভেসেছিলো উত্তরের খালে)।
বিস্বাদ পেয়ালা ঠোঁটে আতঙ্কিত মনে পড়ে কালকের কথা
ক্লাইভের পথ ধরে ইতস্তত হাঁটা আর ভাবনা অযথা।
এক-রোখা সূর্য ধূ-ধূ শান-বাধা পথে-পথে বেপরোয়া ঘোরে
গলির কাছের মোড়ে এলেই পিঠটা যেন সিঁরসির করে।
মানুষের মুখগুলো কিম্ভূত ছবির মতো আঁকা হয়ে গেছে,
সামনে-পিছনে লোকে নিজের মৃত্যুকে শুধু কেবলি খুঁজছে।
বিড়ির ধোঁয়ায় কাশি।—তারপর বিকেলের ভাবি নানা কথা
দক্ষিণে দরজা খোলা মত্ত হাওয়ার দিনে আজ কলকাতা।
...র ফিরবো কিনা একেবারে জানা নেই, হায় জানা নেই
...র্গে পচা মড়ার ভ্যাপসা ঘরে গিয়েছি আগেই।

৫

অরণ্য অরণ্য শুধু। শ্বাপদের মতো চোখ নেভে আর জ্বলে
কোথায় সোনার গাছে হীরের ফসল বুঝি এখনও ফলে।
দিনগুলো উল্কি-আঁকা, রাতগুলো কালো-কালো ফেরারী আসামী
মাটি... আঁচড়... টে লঙ্কা ভাগ করে এক ধূর্ত কালনেমি।
...র আর অসহযোগের সেই তীব্র আন্দোলনে
...ে আর দুর্ভিক্ষ-শ্মশানে আর বিরাট প্লাবনে
...ে বেঁচে মরে আমরা রয়েছি ঘরে বহু লক্ষবার—
...য়ে লুকোচুরি তবুও ধারালো ছুরি আজকে দাঙ্গার।

বিকেলের নদী

হয়তো শিকড় গেছে পৃথিবীর স্নিগ্ধতায় ঘন অন্ধকারে
হয়তো মাটির নীচে ঘুমের ছায়ায় শ্যাম নির্ঝরিণী ঝরে।
অশ্রু আর হাহাকার আলিঙ্গন করে দেখি কবরে-শ্মশানে
ভাসা-ভাসা চোখ দুটি, ভাঙা-ভাঙা কান্না-হাসি—জানো তার মানে ?
তাই তো হঠাৎ মনে আশার ফসল হয়ে ওই ঝড় ওঠে
ফেলে-আসা দিনগুলি হলদে-সোনালি ফুলে অকস্মাৎ ফোটে।
আমাদের আছে মাটি লাঙল ফসল আর সুবর্ণ মরাই
বর্বর রাজার নীতি রুখবো সবল বুকে আমরা নিশ্চই।
তারপর শৈশবের স্বপ্ন-দেখা মর্মরিত স্বচ্ছ নদীখানি
ফসলের গান হয়ে দিগন্ত ভাসিয়ে দিয়ে আসবেই জানি।
সে-নদী দেখেছি আমি বিকেলে হলুদ-নীলে উজ্জ্বল আলোয়
স্ফটিকের স্বচ্ছ চোখ অনায়াসে মুছে দেবে অতীত প্রলয়।